182.0c.925.39.

বৌভাত

(উপন্যাস)

BENGAL LIBRARY
25 AUG 1925
WRITERS' BUILDINGS.
CALCUTTA

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

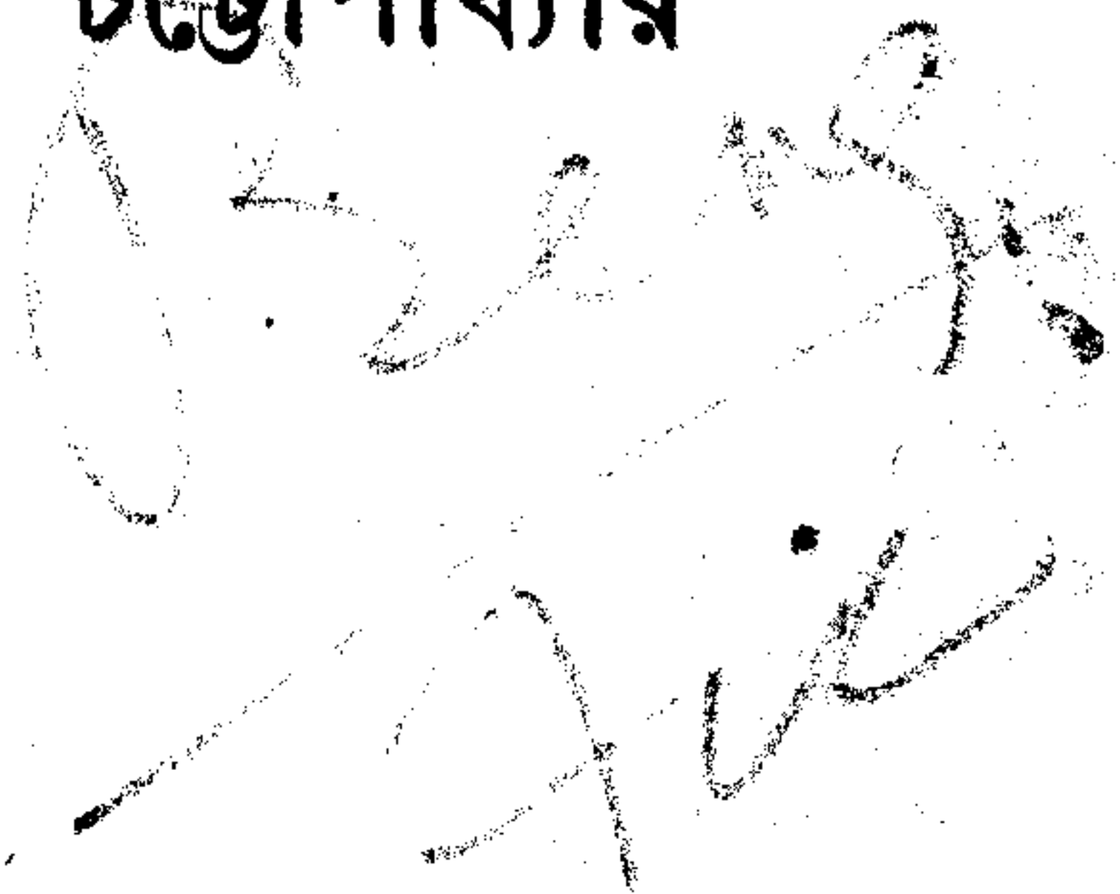

মেটকাফ্ প্রেস্
১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৷৷০

182.0c.925.39.

বৌভাত

(উপন্যাস)

BENGAL LIBRARY
25 AUG 1925
WRITERS' BUILDINGS.
CALCUTTA

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

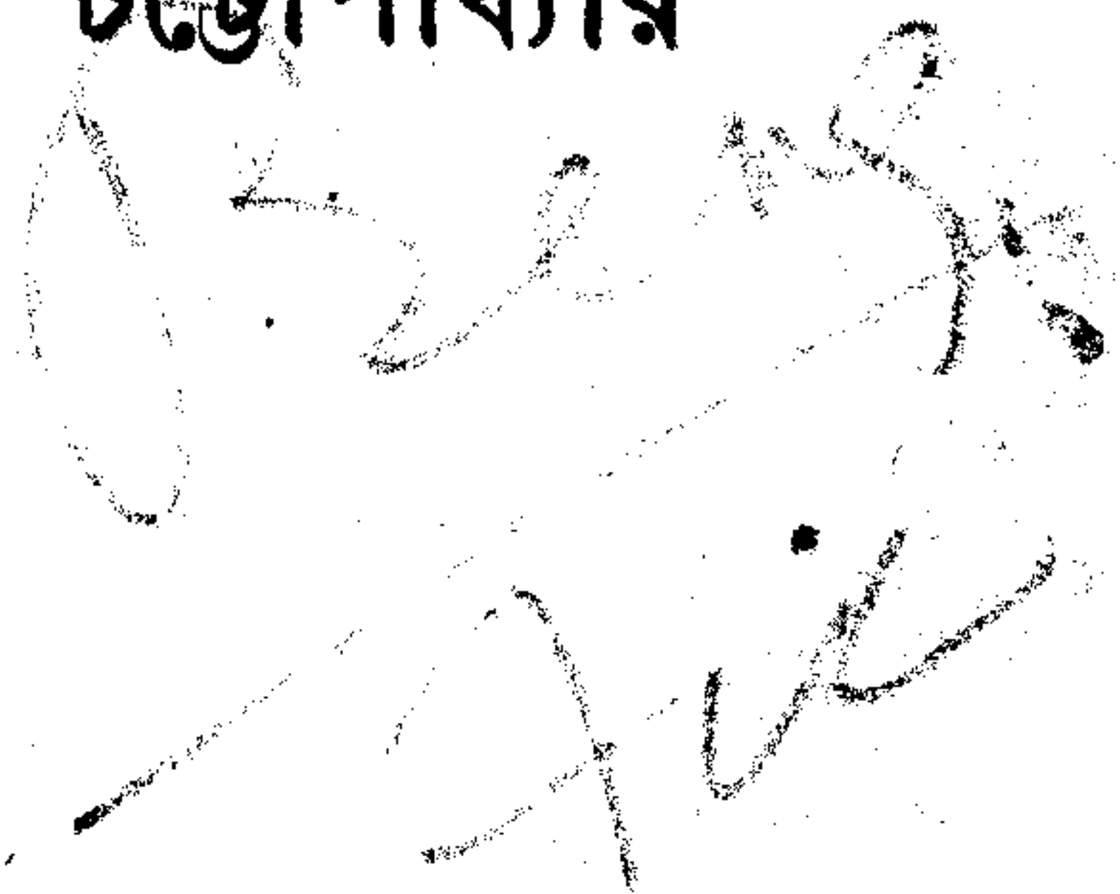

মেটকাফ্ প্রেস্
১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৷৷০

এই লেখকের লেখা বই

১। বিয়ে ... ১৷৷০

২। শুভাশিস্ ... ১৷৷০

৩। আশীর্ব্বাদ ... ১৷৷০

৪। স্বামী-স্ত্রী ... ১৷৷০

৫। অক্ষয় কীর্ত্তি ... ৷৵০

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ বি. এসসি-প্রণীত

১। জন্মভূমি ... ১৷৷০

২। বঙ্গবধূ ... ১৷০

৩। শান্তি-কুটির ... ১৷৷০

৪। স্মৃতি-পূজা ... ১৲

৫। বিয়ের বাঁধন ... ১৷৷০

শ্রীজুড়নজীবন মুখোপাধ্যায় বি. এসসি প্রণীত

১। নারীর মূর্ত্তি ... ১৸০

শ্রীক্ষুদিরাম গঙ্গোপাধ্যায় এম. এসসি প্রণীত

১। সুরূপা ... ১৷৷০

Printed & Published by
SHASI BHUSHAN PAUL
at the—METCALFE PRESS
15, Nayan Chand Dutt Street, Calcutta.

BL 45.
3 Aug 1925

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়

পিতাঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে।

কালিঘাট ইনিষ্টিটিউট
সাহিত্য সমিতি
শ্রাবণ
১৩৩২

সেবক
নরেন

উপহার

.....

.....

.....

শ্রী.....

তারিখ.....

বৌভাত

[১]

সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে মনোতোষ যখন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিভাগের কোনও বিভাগেই প্রতীবের নাম দেখিতে পাইল না, তখন রোষে ক্ষোভে গর্জ্জিয়া উঠিয়া ডাকিল—প্রতীব।

তাহার এই প্রতীব ডাকটার মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিক সুর ছিল, যাহা শুনিয়া গৃহিণী মাতঙ্গিনী অতি মাত্রায় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি বাইরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে? অত চেঁচাচ্চ কেন?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া মনোতোষ জিজ্ঞাসা করিল—বলি, হতভাগাটা গেল কোথা?

মাতঙ্গিনী মুখখানা ঘুরাইয়া বলিল—কোন্ দিন বা সে এমন সময় বাড়ী থাকে বল?—সেত এখন ভগা বাগ্দির আখড়ায়। শুনিয়া মনোতোষ অধিক উত্তেজিত হইয়া ভৃত্যকে ডাকিল—মাধব!

বৌভাত

মাধব এ বাটীতে বহু দিন হইতে কাজ করিয়া আসিতেছে, হঠাৎ বাবুর এইরূপ চীৎকারের কোনও কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে মনিবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোতোষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—প্রতীব কোথায়রে মাধব?

মাধব তাহার হাত দুটা কচলাইতে কচলাইতে উত্তর দিল—এজ্ঞে কত্তা! ছোট বাবু এখন লাঠী খেল্‌তে গিয়েছে। মুখ বিকৃত করিয়া মনোতোষ বলিল—লাঠি খেল্‌তে গিয়েছে, যা শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়, আজ তারই এক দিন, কি আমারই এক দিন। হতভাগা নচ্ছার!

মাধব তাহার মনিবের এরূপ উগ্রমূর্ত্তি কখনও দেখে নাই, সে কোনও উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা! প্রতীবকে এত জোর তলব কেন? কোনও দিনই ত তাকে এ সময়ে খোঁজ পড়ে নাই।

মনোতোষ গম্ভীর ভাবে বলিল—হতভাগাকে আজ বাড়ী ছাড়া করে তবে অন্য কাজ, এত দিন তার জন্যে যে টাকাগুলা জলের মত ব্যয় করলাম সে সব ভস্মে ঘি ঢালা হলো।

হঠাৎ এতটা ক্রোধের কারণ কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বলি হয়েছে কি তাই বলনা? মনোতোষ ও রাগান্বিত স্বরে বলিল—হ'বে আবার কি? বাবু ফেল হ'য়ে বসে আছেন।

এতক্ষণে স্বামীর ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি

হাসিয়া বলিল—ও—তুমি বুঝি মনে করেছিলে—সে পাশ হ'বে? ও আমার পোড়া কপাল, সে পড়ত কখন যে পাশ হ'বে? তোমায় আমি বলিনি?

মনোতোষ স্ত্রীর এই শ্লেষপূর্ণ কথায় যেন পরাজিত হইয়া বলিল—তা বলেছিলে বটে মাতু! কিন্তু ভবতোষের মৃত্যু শয্যায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম সে প্রতিজ্ঞাটা ত রক্ষা করতেই হবে, তা না হ'লে লোকেই বা বলবে কি? তা ছাড়া ছোড়াটার আর এক দিক দিয়েও ত সর্ব্বনাশ করেছি। কাজেই এতদিন চেপেছিলাম।

কথাটা শুনিয়া কি জানি কেন মাতঙ্গিনীর মুখখানা আপনা-আপনিই গম্ভীর হইয়া গেল! সে সেই ভাবেই বলিল—ও ভারি ত প্রতিজ্ঞা! এত দিন আমার কথা আদৌ শোননি, একটা পরের ছেলের জন্যে কে আর অত করে? তুমি যাই, তাই কেবল তার জন্যে কতকগুলো টাকার ছাদ্দ করেছ। আর অন্য কেউ হলে এতদিন কবে দূর করে দিয়ে নিশ্চিন্তি হ'তো।

স্ত্রীর অভিমান বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল—তোমাকে ত বার বার বলে এসেছি মাতু, যে, সুযোগ পেলেই হতভাগাটাকে দূর করে দেব, এত দিনে সে সুযোগ এসেছে; এই বার দেখনা কেমন তাকে কুকুর তাড়ানর মত দূর করে দিই।

মাতঙ্গিনী কোনও দিনই প্রতীবকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারে নাই। তাহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য বার বার স্বামীকে

উত্তক্ত করিত, কিন্তু কি জানি কেন কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মনোতোষ মাতঙ্গিনীর কথায় কর্ণপাত করিত না, বরং প্রতীবের উপর বেশী রকমই স্নেহ দেখাইত। ইহার জন্য স্বামীর সহিত মান অভিমান তর্জ্জন গর্জ্জন ইত্যাদি চলিত। আজ তাহাকে তাহার স্বমতে আসিতে দেখিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিল—দেখ দেখি আগে যদি তোমার এ সুবুদ্ধি হ'ত তবে আর মিছামিছি এতগুলো টাকা বরবাদে যেত না, যাক্ এখন যা হবার তা ত হয়েছে, এত দিন ধরে তাকে লেখাপড়া শেখালে, এখন তার উপায় করে খাবার ক্ষমতা হয়েছে, এইবার তাকে আস্তে আস্তে বিদায় করে দাও।

মনো। সে সব আবার ব'লতে? হতভাগাটাকে আর মুহূর্ত্তের জন্য যদি এ বাটীতে যায়গা দিই তবে আমার নামই মনোতোষ নয়, পরের অন্ন ধ্বংস করে কেবল ষাঁড় হয়ে উঠ্‌ছে। তার ভিরকুটী ভেঙ্গে তবে আমার অন্য কাজ।

স্বামীকে আরও উত্তেজিত করিবার জন্য মাতঙ্গিনী বলিতে লাগিল—কেবল একটা দিক দেখলে ত আর হবে না; আর একটা দিক দেখলে তাকে এখনই বাড়ী ছাড়া করা দরকার হয়ে পড়েছে। ঘরের এক দিকে আগুন লেগেছে, এই সময় হতে সে আগুন যদি নেভাবার চেষ্টা করা না হয়; তবে শীগ্গির সে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌বে, তখন আর যে নেভাবার উপায় থাক্‌বে না।

কথাটা ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া মনোতোষ উদ্বিগ্নভাবে

বলিয়া উঠিল,—কিছু কি হয়েছে মাতু? কৈ এত দিন ত কিছুই আমাকে বলনি?

মাত—কি করেই বা বলি বল, মাতুর কোন্ কথাটাই বা শোন? তুমি না শুন্‌লেও এ বাটীর কোথায় কি হচ্চে না হচ্চে তা আমার নজর এড়ায় না, বুঝলে?

মনো—ব ল ব্যাপারটা কি? ভেঙ্গেই বল না।

মাতঙ্গিনী চুপি চুপি কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় মাধবের সহিত প্রতীব সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই মনোতোষ আবার রাগে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিল—কোথায় গিয়েছিলিরে হতভাগা? —তোর পাশের খবর বেরুলো?

বিনীত ভাবে প্রতীব বলিল—আজ্ঞে হাঁ।

পাশ হয়েছিস?

আজ্ঞে না।

শুনিয়া মনোতোষ চীৎকার করিয়া বলিল—"আজ্ঞে না";—অথচ লাঠি খেল্‌তে ত খুব পেকে উঠেছিস্, যা আজ থেকে লাঠী খেলেই ভাতের যোগাড় কর্‌গে, আমার ঘরে আজ হ'তে আর ভাত নাই—বুঝলি?

প্রতীব বিনীতভাবে বলিল, আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখব।

মনোতোষ গলা উচুপর্দ্দায় চড়াইয়া বলিল, তাই যদি দেখতে হয় তবে অন্য যায়গায় গিয়ে দেখিস্ আমার এখান হ'তে আর হবে না।

প্রতীব—আজ্ঞে—

মনোতোষ আর সহ্য করিতে পারিল না, অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিল—কোনও কথা শুন্‌তে চাইনে হতভাগা, আর এক ঘণ্টা পরে যদি তোকে এ বাটীতে দেখি তবে তোকে কুকুরের মত দূর করে দেব, দূরহ আমার সামনে থেকে।

পিতার চীৎকার শুনিয়া তাহার কন্যা তৃপ্তি ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, ক্রোধে তাহার পিতার চক্ষু রক্তবর্ণ, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে, তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল—কেন অত রেগে যাচ্চ বাবা? আস্‌ছে বারে প্রতীবদা' নিশ্চয়ই পাশ কর্‌বে—

বাধা দিয়া মাতঙ্গিনী বলিল—তুই থাম তৃপ্তি, তোকে আর জ্যাঠামি কর্‌তে হবে না।

কথাটা তৃপ্তির আদৌ ভাল লাগিল না, বলিল—আচ্ছা নতুন মা! তুমি কি রকম লোক বলত? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ, অথচ বাবা কি রকম রেগে উঠেছে দেখেও তুমি চুপ করে রয়েছ!

তৃপ্তির কথাটায় মাতঙ্গিনীর সর্ব্ব শরীরে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল। চুপ কর হারামজাদী, বলিয়াই তাহার গণ্ডদেশে ঠাশ্‌ করিয়া জোরে একটা চড় মারিয়া দিল।

প্রতীব তাড়াতাড়ি মাতঙ্গিনীর হস্ত হইতে তৃপ্তিকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল, দেখিয়া মনোতোষ আরও রাগিয়া উঠিয়া কি এত বড় স্পর্দ্ধা, বলিয়া তাহার গলাটা টিপিয়া একটা ধাক্কা মারিল।

প্রতীব এমনটার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না, তাহার কাকার এই কাণ্ড দেখিয়া সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। এই অবসরে মনোতোষ পুনরায় তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, তৃপ্তি যাইয়া তাহাদের মধ্যস্থলে বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। মাতঙ্গিনী তৃপ্তির এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করিতে পারিল না, প্রহার দিয়া তাহাকে তাহাদের মধ্য হইতে টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

মনোতোষ পুনরায় প্রতীবকে চীৎকার করিয়া বলিল, মাত্র এক ঘণ্টা সময়—এর পরেও যদি আবার তোকে দেখি তবে তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন—বলিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া ক্রোধে দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে গৃহিণীর পশ্চাদনুসরণ করিল।

মাধব এতক্ষণ সেই স্থলেই হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়াছিল, ভাবিতেছিল, হায়রে কলি! কি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপেই তুমি রাজত্ব করছ। প্রতীব বিষাদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—এ কি হল দাদা?

মাধব ও তেমনি হতাশ ভাবে বলিল—কি করে জানবো দাদা!

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী দক্ষিণডিহী একটী গণ্ড গ্রাম। এক সময়ে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাক প্রভৃতি সর্ব্ব শ্রেণীর সমবায়ে এই গ্রামখানি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, নরসুন্দর, রজক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক এই গ্রামখানির মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সম সুখ দুঃখ ভাগী হইয়া সদ্ভাবে বাস করিত। এক কথায় বলিতে গেলে—সমাজে বাস করিতে হইলে প্রতিনিয়ত যাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, দক্ষিণডিহীবাসীদিগকে তাহার জন্য গ্রামের বাহিরে যাইতে হইত না। এখন জঙ্গলের ভিতরে ভগ্ন বসত বাটীর স্তূপ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

প্রতীবের পিতা ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় ও তাহার বন্ধু মনোতোষ তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি বড় কম পায় নাই। মনোতোষ পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তেজারতি ব্যবসায় আরম্ভ করিল, আর ভবতোষ আমাদের জাতিয় মজ্জাগত দোষ এড়াইতে না পারিয়া কলিকাতায় এক সওদাগরী অফিসে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। সে প্রতি শনিবারে, অফিসের ছুটি হইলে, গ্রামখানির মধ্যে ছুটিয়া আসিত এবং প্রায় সব সময় মনোতোষের সহিত কাটাইয়া দিত। এইরূপ ভাবে কিছু দিন বেশ চলিয়া গেল। তারপর হঠাৎ এক দিন

বৌভাত

প্রতীব নবাগতরূপে কোন অচেনা অজানা দেশ হইতে আসিয়া ভবতোষের গৃহ খানি হাসি ভরা করিয়া দিল। এই একটী ছোট শিশুর মায়ায় ভবতোষ এমনই জড়াইয়া পড়িল যে প্রত্যেক শনিবার সকাল হইতেই বাটী আসিবার জন্য তার প্রাণটার মধ্যে একটা সাড়া উপস্থিত হইত। স্ত্রী দীপ্তির ও ভবতোষের দিনগুলি এই শিশুটীকে অবলম্বন করিয়া একরূপ বেশ সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে কিন্তু আর বেশীদিন তাহাদের চলিল না। উপর হইতে একখানি অদৃশ্য হস্ত তাহাদের এই সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দিল। তিন বৎসরের শিশু প্রতীবকে ভবতোষের হস্তে দিয়া দীপ্তি কোন এক মহাদেশে মহাযাত্রা করিল। তারপর এই তিন বৎসরের শিশুর লালন পালনের জন্য ভবতোষ চাকরি ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া বসিল।

ভবতোষ এই তিন বৎসরের শিশুটীর লালন-পালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল। স্ত্রীর অন্তিম শয্যার শেষ অনুরোধ, হৃদয়ের সমস্ত শক্তিটুকু দিয়া পালন করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু প্রতীবের উপর এমনই ভাবে ঢালিয়া দিয়াছিল, যে, প্রতীব মাতার অভাব এতটুকুও কোনওরূপে জানিতে পারে নাই, ভবতোষ তাহার মাতা ও পিতার অভাব পূর্ণ করিয়া দিত।

গ্রামের অনেকে এমন কি অভিন্ন হৃদয় বন্ধু মনোতোষও তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেও সে তাহাতে

কিছুতেই স্বীকৃত হয় নাই। প্রতীবের বালসুলভ চপলতা, তাহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা, তাহার স্বর্গীয় সুষমা মণ্ডিত মধুর হাসি, ভবতোষকে এমন এক ভাবরাজ্যে লইয়া গিয়াছিল, যে, তাহার কাছে পুনরায় সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একটা মস্ত বড় কর্ত্তব্যের অবহেলা বলিয়া মনে হইত। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া সাতটী বৎসর কাটিল।

এই সাতটী বৎসর ভবতোষের হৃদয়ে প্রতীব এমনই ভাবে জড়াইয়া বসিল যে ভবতোষ সমস্ত সংসারটাকে প্রতীবময় দেখিতে লাগিল, শয়নে স্বপনে প্রতীব; আহারে বিশ্রামে প্রতীব, এক দণ্ড প্রতীবকে না দেখিলে দশ দিক অন্ধকার দেখে। প্রতীব যদি কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য মনোতোষের বাটী খেলিতে যায় তবে সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভবতোষ তাহাকে আনিবার জন্য তাহাদের বাটী ছুটিয়া যায়, তাহার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া মনোতোষের স্ত্রী তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইত, বড়ঠাকুরকে বল, আমরা কি প্রতীবের পর? এসেছে দু-দণ্ড থাকনা, আমার তৃপ্তিও যেমন প্রতীব ও তেমনই। আমার একটা কোল তৃপ্তির আর একটা কোল প্রতীবের।

শুনিয়া ভবতোষ বলিত—তা জানি মা, আমার প্রতীবের উপর তোমার যে কতটা স্নেহ তাকি আর জানি না? তবে কি জান বৌ-মা! মায়া—মায়া। জানি কেউ-ই আমার নয়, তবুও কেমন এক দণ্ড না দেখে থাকতে পারিনে বৌ-মা! ছোঁড়াটা আমায় এমনই বাঁধনে বেঁধেছে, শুনিয়া ইন্দুর চোখের কোণে জল গড়াইয়া

পড়িত, ভাবিত এতটা শক্তি দিয়ে ছেলেকে মাতা পিতা মানুষ করে সেই ছেলেই আবার কালে মাতা পিতাকে দূর করিয়া দেয়, হায়রে !

ভবতোষ এই কয় বৎসর বুকের রক্ত জল করিয়া প্রতীবকে দশ বৎসরেরটী করিয়া তুলিল কিন্তু আর বুঝি পারে না, কোথা হইতে যক্ষা আসিয়া ভবতোষকে আক্রমণ করিল। এই যক্ষাই তাহার কাল হইল, মনোতোষ ও তাহার স্ত্রী ইন্দু ভবতোষের চিকিৎসার ও সেবার কোনওরূপ ত্রুটী করিল না। এক দিন ভবতোষ, প্রতীবকে মনোতোষ ও ইন্দুর হস্তে সমর্পণ করিয়া কোন এক দূর দেশে মহাপ্রস্থান করিল। প্রতীব চীৎকার করিয়া পিতার বুকে আছাড়ি বিছাড়ি খাইতে লাগিল। ইন্দু চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল। সেই অবধি প্রতীব মনোতোষের আশ্রয়েই প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

মনোতোষ ও ইন্দুর স্নেহ-যত্নে ও তৃপ্তির সহিত একত্র খেলা ধূলায় প্রতীব ক্রমে ক্রমে পিতৃশোক ভুলিয়া গেল। ইন্দুর স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়া, মনোতোষের সস্নেহ ব্যবহারে পিতা মাতার অভাব আদৌ সে বুঝিতে পারিল না। প্রতীবের সামান্য অসুখে ইন্দু দশ দিক্ অন্ধকার দেখিত। সময়ে আহারাদি না হইলে তিরস্কারে বাড়ী মাথায় করিত।

তাহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া মনোতোষ হাসিয়া বলিত, ইন্দু ! এ যে আঁতের চেয়ে ছড় বেশী দেখছি, শুনিয়া ইন্দু রাগিয়া উঠিত ও বলিত, কি করি বল, মরণের সময় হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছেন ; একটু

দেখা শুনা না ক'রলে যে মৃত্যুর পরপারে গিয়েও তাঁর শান্তি হবে না। মনোতোষ পরিপূর্ণ আবেগে বলিয়া উঠিত, সকলে যদি তোমার মত স্ত্রী পেত ইন্দু! বাধা দিয়া ইন্দু বলিত—যাও যাও খুব হ'য়েছে, ইন্দুকে তুমি যে চক্ষে দেখ সে কিন্তু ঠিক ততটা নয় বুঝ্‌লে।

ইন্দুর স্নেহ-শীতল ক্রোড়ের মধ্যে এমনই ভাবে প্রতীবের দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল, তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুর আগ্রহাতিশয্যে মনোতোষ তাহাকে গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দিল, কিন্তু এই এতটা সময়, এগারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত প্রতীবকে না দেখিয়া এই স্নেহময়ী নারীটীর প্রাণ যে কিরূপ হইয়া উঠিত, তাহা সে ভিন্ন আর কেহ জানিত না। প্রতীবও এতটা সময় তাহার করুণাময়ী কাকীমাকে না দেখিয়া ছট্ ফট্ করিতে থাকিত, শেষে প্রাণের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিত—কাকীমা! আর আমি স্কুলে যাব না।

ইন্দু স্নেহ তিরস্কার করিয়া বলিত, সে কি কথা প্রতীব?

প্রতীবও ছল্ ছল্ চক্ষে বলিয়া উঠিত—না কাকীমা, তোমায় ছেড়ে আমি এক দণ্ড থাক্‌তে পা'রব না, স্কুলে তোমার জন্যে আমার প্রাণটা যে কি করে, তা আর কি বলব কাকীমা। শুনিয়া ইন্দুমতী তাহাকে কোলে বসাইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া বলিত, কেন রে, এই সময় টুকুর মধ্যে কি আমি মরে যাব, যে তোর এত ভয়? তাড়াতাড়ি তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া প্রতীব কাঁদ কাঁদ মুখে বলিত. না কাকীমা, অমন কথা বলো না, তা'হলে আমি

আর বাঁচবনা। ইহা শুনিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া চুমা খাইয়া ইন্দু বলিত—না রে পাগল না, শুধু শুধু আমি মর্‌তে যাব কেন? তোর বিয়ে হোক, বৌ আসুক, তবে আমি মরব!

তাহার মরিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, প্রতীবের প্রাণ এক দণ্ডও কাকীমার কাছ ছাড়া হইতে না চাহিলেও মানুষের বাসনা ওলট পালট করে দেবার যে অধিকারী, সেই তাহাদের এই গোপন বাসনা-টাকে ওলট পালট করিয়া দিল। সে বৎসর দক্ষিণডিহীতে ওলাউঠার প্রকোপ খুব বাড়িয়া উঠিল, ব্যাধিটা এমন সংক্রামক হইয়া উঠিল, মৃত্যু আসিয়া এমন ভাবে তাহার সংহার মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল, যে সকলে তাহাতে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রত্যহই গৃহস্থের বাড়ী হইতে বুক ভাঙ্গা ক্রন্দনের রোল আকাশ বাতাশ মথিত করিয়া হাহাকারে গ্রাম ভরাইয়া তুলিল। দেখিয়া ইন্দুর অত্যন্ত ভয় হইল। মনোতোষকে বলিল, ছেলে দুটোকে বাঁচাবার জন্যে চল অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য এ গ্রাম ছেড়ে পলাই, মনোতোষ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া, কলিকাতায় যাইবার স্থির করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল, কিন্তু মৃত্যু যাহার শিয়রে সে পলাইবে কোথায়? কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বেই ইন্দু সেই ভীষণ রোগে আক্রান্তা হইল। প্রথমটা সে বুঝিতে পারে নাই, যখন বুঝিতে পারিল তখন সে মৃত্যুর পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, মনোতোষ তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনাইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ডাক্তারের সযত্ন চিকিৎসা, মনোতোষের ব্যাকুলতা তৃপ্তি ও প্রতীবের কাতর ক্রন্দন উপেক্ষা

বৌভাত

করিয়া ইন্দুর প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত আকাশের গায়ে উড়িয়া গেল, দুইটী বালক বালিকা আকুল ক্রন্দনে বাড়ীখানাকে ভাসাইতে লাগিল!

দিন যায় দিন থাকে না, তা সে সুখেরই হৌক আর দুঃখেরই হৌক। মনোতোষেরও দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল, ক্রমে ইন্দুর শোক কিছু কিছু কমিয়া আসিতে লাগিল। সে বালক বালিকা দুটির জন্য এক দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়িল,—এই দুইটীকে লালন পালন সে কিরূপে করিবে? অন্য উপায় না দেখিয়া সে পুনরায় বিবাহ করিতে মনস্থ করিল।

পোড়া বাঙ্গালার সমাজে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার অভাব নাই। মনোতোষের সঙ্কল্প শুনিয়া অনেকেই তাহার হস্তে কন্যাদান করিতে মনস্থ করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। শেষে বসন্তপুরের হৃদয় ঘোষালের কন্যা মাতঙ্গিনীকে বিবাহ করিয়া মনোতোষ অনেকটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অপোগণ্ড দুইটীর জন্য ত আর হাত পুড়াইতে হইবে না!

দুইবেলা রন্ধন কার্য্যের হস্ত হইতে মনোতোষ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু আর একটা অশান্তিতে সে জড়াইয়া পড়িল। সে কল্পনাতে আনিতে পারে নাই যে প্রতীবকে দূর করিয়া দিবার জন্য মাতঙ্গিনী বার বার জেদ করিবে। তৃপ্তিকেও সে সুনয়নে দেখিতে পারিত না, তবে তাহার জন্য সে ততটা ব্যাকুলা নয়, কারণ দু'বৎসর পরে তাহার বিবাহ হইলে, সে শ্বশুর বাড়ী চলিয়া যাইবে, কিন্তু প্রতীব?—এই একটা অপোগণ্ড কুপোষ্য পুষিবার কোনই সঙ্গত কারণ মাতঙ্গিনী নির্ণয় করিতে পারিল না। তাহাকে যে কোন অছিলায় দূর করিয়া দিবার জন্য মাতঙ্গিনী মনতোষকে বিব্রত করিয়া তুলিত।

মাতঙ্গিনী কারণে অকারণে প্রতীবের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলে পূর্ব্বের মত আর তাহার আহার জুটিত না, বরং সংসারের খুটিনাটি কার্য্য করিবার জন্য মাতঙ্গিনী আদেশ করিত। আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইলে আহারের স্থলে তাহার অদৃষ্টে তিরস্কার, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। মনোতোষ এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিত না, প্রতীবকে অযথা এইরূপে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে একটা বিক্ষোভ উপস্থিত হইত।

ভাবিত কেন? কি দুঃখ প্রতীবের? কেন অকারণে এইরূপ ভাবে সে লাঞ্ছিত হইবে। তাহার কি নাই? সে ত আমার নিকট দুইটী অন্নের ভিখারী নয়। বরং তাহার যাহা আছে তাহা হইতে উহার খরচ বাদে আমারই বাস্কে বৎসরে অনেক টাকা জমিয়া যাইতেছে। সে মনে করিলেও স্ত্রীর হস্তের লাঞ্ছনা হইতে তাহাকে কোনরূপে রক্ষা করিতে পারিত না, এবং সে সাহসও তাহার ছিল না।

কি শক্তি এই স্ত্রী জাতির! যে মনোতোষ প্রতীবের জন্য এতটা করিত, এতটা ভাবিত, সেই মনোতোষই আবার কিছু দিন পরে স্ত্রীর হস্ত পুত্তলি হইয়া উঠিল। যে প্রতীবকে সে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিত, যে প্রতীবকে ইন্দুর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য জামাতৃরূপে বরণ করিবার তাহার একান্ত আগ্রহ জন্মিয়া ছিল, সেই প্রতীবের বিষয়ে সে এমন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া গেল। পূর্ব্বের মত স্ত্রীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার আর কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিত না। এমন কি শ্বশুর হৃদয় ঘোষালের পরামর্শে প্রতীবের এমন সর্ব্বনাশ করিল, যে জগতে কেহ তাহা পারে কিনা সন্দেহ।

তৃপ্তি ও প্রতীব মনদুঃখের বোঝা, নির্জ্জনে কাঁদিয়া লাঘব করিবার চেষ্টা করিত। একজন আর একজনকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেই কাঁদিয়া ফেলিত। এইরূপ ভাবে এই দুইটী বালক বালিকার দিন কাটিতে লাগিল। ইন্দু যখন জীবিত ছিল তখন

তাহার ইচ্ছা ছিল প্রতীবকে একটু ভিন্নরূপে গড়িয়া তোলা। ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালীর ছেলে না করিয়া প্রতীবকে সাহসী বলবান বাঙ্গালীর ছেলে করিয়া তোলা এবং এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সে তাহাকে ভগা বাগ্দীর সমিতিতে পাঠাইয়াছিল। সেখানে লাঠী, শড়্কি, বল্লম প্রভৃতির খেলার উৎকর্ষ সাধিত হইত। ভগবান নিজে সমস্ত শিক্ষার্থীদিগকে প্রাণপণচেষ্টায় এই সব খেলা শিক্ষা দিত। তাহারও ইচ্ছা ছিল বাঙ্গালীর ছেলেদিগকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলে যেন তাহারা বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়া পরিচয় দিতে পারে।

প্রতীবও এই খেলাতে এমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল, যে লেখাপড়া শিক্ষাটাকে খেলাধূলার অপেক্ষা অধিক বড় বলিয়া মনে করিত না; বিশেষতঃ যখন তাহাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিত যে বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া তিরিশ চল্লিশ টাকা মাহিনার কেরাণী হইয়া চিরকাল অম্ল অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মূর্খ থাকিয়া সুস্থ ও সবল দেহ ধারণ করা অনেক ভাল, তাহাতে প্রাণের মধ্যে একটা তৃপ্তি আসে—তখন সে বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইবার আকাঙ্খাটাকেই মূল্যবান মনে করিত।

বিদ্যালাভের জন্য সে ততটা চেষ্টা করিত না, যতটা চেষ্টা করিত দেহের শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সে ভগবান বাগ্দীর আখড়ায় খেলায় উন্মত্ত থাকিত। ইহার জন্যও মাতঙ্গিনীর

নিকট সে কারণে অকারণে নির্য্যাতন ভোগ করিত। মনোতোষও দুই একদিন একটু তিরস্কার করিত বটে, কিন্তু সেটা তত্তটা আন্তরিক নয়।

মাতঙ্গিনী ইহার জন্য মনোতোষের নিকট অভিযোগ করিলে, মনোতোষ বলিত, ধীরে মাতু ধীরে, উহার যে সর্ব্বনাশ আমরা করেছি, তাহার উপর এতটা তাড়াতাড়ি ভাল নয়।

মাতঙ্গিনী বলিয়া উঠিত, আমার কথা আর কবে তুমি শোন বল। আমি তোমার ঘরের দাসী বাঁদী বইত নয়। অন্য কেউ হলে এত দিন ওকে দূর করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতো।

তাহার এই অভিযোগ শুনিয়া মনোতোষ তাহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিত, দেখ মাতু ধর্ম্ম বলিয়া একটা জিনিস আছে, সেটা তো তোমার আমার সকলকেই মেনে চলতে হবে! তুমি আমি উহার যে সর্ব্বনাশ করেছি তাহা শুনিলে লোকে শিহরিয়া উঠিবে, এ অবস্থায় এতটা তাড়াতাড়ি ভাল নয় তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক সময় হইলে ছোঁড়াটাকে দূর করিয়া দিব।

এইরূপ ভাবে প্রতীবকে লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই বাদানুবাদ চলিত—অবশেষে স্ত্রীর কথা রক্ষা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া, মনোতোষ স্থির করিয়া লইল—দূর হউক ধর্ম্ম, দূর হৌক লোক লজ্জা—এ অশান্তি আর সহ্য হয় না। এবার হইতে সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। তার পর যখন প্রতীব মাতৃকুলেশন পরীক্ষায় অকৃত কার্য্য হইল তখন মনোতোষ

মাতঙ্গিনীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার একটা পথ দেখিতে পাইল ও তাহাকে বাটী হইতে এক ঘণ্টার মধ্যে দূর হইবার আদেশ দিল।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রতীব কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহার আশা ভরসা কল্পনা, এই ঘটনায় সমস্তই ওলট পালট হইয়া গেল। এতদিন ধরিয়া অন্তরের নিভৃত কন্দরে যে আশালতিকার মূলে সহস্নে বারি সিঞ্চন করিতেছিল, সেই আশা লতিকা ফল পুষ্পে শোভিত হইবার পূর্ব্বেই প্রতিবেশী পিতৃবন্ধু পিতৃব্য তুল্য মনোতোষের পীড়নরূপ একটা দমকা ঝড়ে সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িল। দারুণ দুশ্চিন্তায় তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া গেল। তাহার চিন্তার শেষ নাই, সীমা নাই। আজ দুইদিন এবাটীতে এক মুষ্টি অন্ন পায় নাই। গুরুজী ভগবান বাগ্দী এবং গ্রামের অন্যান্য দুই এক জনের দয়ায় কোনওরূপে এক বেলা এক মুষ্টি জুটিতেছে। মনোতোষের ব্যবহার তাহাকে পাগলের মত করিয়া তুলিল। সে ভাবিতে লাগিল, কাকার চরণে এমন কি অপরাধ করিয়াছি যাহার জন্য তাঁর এত ক্রোধ। সত্যই কি তাঁর ক্রোধের কারণ একমাত্র আমার পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্যতা—না—ইহার মধ্যে আর কোনও রহস্য নিহিত আছে? কিন্তু তাঁরত প্রকৃতি এরূপ ছিল না। তাঁহার স্নেহপুটে আশ্রয় না পেলে আবাল্য তাঁহার স্নেহ শীতল ছায়ায় লালিত পালিত না হলে এতদিন আমার অস্তিত্ব, স্রোত মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায়

IMPERIAL

ভাসিয়া যাইত। কাকীমার তীক্ষ্ণ বাক্যবান আমার হৃদয়কে যখন ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছে তখন কাকারই স্নেহময় আশ্বাষবাণী সেই ক্ষতে প্রলেপ দিয়াছে। অথচ সেই কাকার প্রকৃতি আজ ভিন্নমুখী, হায়রে ভাগ্য!

শৈশবে মাতৃহারা হয়েও পিতার স্নেহ কোলে মাতার অভাব একদিনের জন্য বুঝিতে পারি নাই, তারপর নিঠুর নিয়তির তাড়নায় সেই পিতাও আমার পরিত্যাগ করে গেলেন। তারপর কাকার হাতে আমাকে সপিয়া দিলেন। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! এটুকুও তোমার সহ্য হইল না? কি অপরাধ করেছি আমি? আমার এই অভিশপ্ত জীবন কতকাল বহন করতে হবে। ভাবিতে ভাবিতে নৈরাশ্যের তীব্র বেদনা তার বুকের মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিল।

তাহার এই চিন্তারাশিকে হঠাৎ বাধা দিয়া তৃপ্তি ডাকিল, দাদা।

প্রতীব আজ তিনদিন এই দাদা ডাকটা শুনে নাই। শুনিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সেই চেষ্টা বিফল করিয়া অন্তর হইতে কে যেন বলিয়াছে আর নয়, আর নয়—সে আশা ত্যাগ কর। আজ হঠাৎ সেই ডাক শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিল তৃপ্তি! এসেছিল্ বোন্? অনেক দিন তোর ডাক শুনিনি।

তাহার এই কাতরতা, এই উদ্বিগ্নতা দেখিয়া তৃপ্তির হৃদয়টা

আলোড়িত হইয়া উঠিল। হায়, তাহার দাদা—এমন সরল উদার, নম্র দাদা—পিতা কেন তার উপর এতটা প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তাহার কান্না আসিল। কোনওরূপে উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, একদিনে তোমার কি চেহারাই হয়ে গিয়েছে দাদা? তোমার ভাবনা কিসের?

ভাবনার কি কিছুই নাই বোন?

তৃপ্তি—দাদা! তোমরা না পুরুষ সিংহ?—তোমাদের চিন্তা কি? তোমার ঐ কর্ম্মক্ষম সুদৃঢ় হস্তপদ থাকৃতে কেন তুমি অন্যের দয়াদত্ত অন্নে নিজকে পুষ্ট করবে?—না দাদা তা হবে না—তুমি এমন হেনস্থার অন্ন হজম ক'রতে পা'রবে না।

প্রতীব :—তবে তুই বলে দে তৃপ্তি—কি করব আমি? স্বর্গহতেও গরিয়সী এই ছোট গ্রামখানি ছেড়ে যেতে প্রাণের মাঝে যে কিরূপ আকুলি বিকুলি করছে তা তুই কি বুঝ্‌বি তৃপ্তি? অথচ এই গ্রামেই আমার সব আছে।

তৃপ্তি :—দাদা! আজ এ গ্রাম খানাকে ছাড়বার জন্য তোমার এতটা কাতরতা কেন জানি না, তুমিইত বল দাদা, সারা বাংলা দেশটা আমাদের জন্মভূমি, তবে এত ব্যাকুলতা কেন?

প্রতীব :—গ্রামখানিকেই বা আমায় ছেড়ে যেতে হবে কেন বোন—আমার ত সবই রয়েছে, বাড়ী ঘর জমী যায়গা, সংসারে বাস করতে গেলে লোকের যা কিছু প্রয়োজন সবই ত আমার রয়েছে—আমার সব থাকৃতে সব ফেলে বিদেশে যেতে হবে।

শুনিয়া আনন্দে ও হৃদয়ের আবেগে তৃপ্তি বলিল সত্য নাকি দাদা ?—কেন তবে তুমি—তোমার সব থাকতে—শৃগাল কুকুরের মত—অপমানিত হও ? বাবার নিকট আজই তোমার বিষয় সম্পত্তি ফেরত চাও।

কদিন ধরে তাই মনে করছি বোন, কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ একটা দ্বিধা আসিয়া আমার মুখখানা চাপিয়া ধরিতেছে বলি বলি করে কিছুই বলতে পারছি না।

বেশ তুমি যদি বলতেই না পার দাদা—আমিই আজ বাবাকে বলবো। শুনিয়া প্রতীব ব্যস্তভাবে বলিল, না বোন বলিস্ নি, কাজ নেই আমার ওছার বিষয়ের কথায়; তার চেয়েও—

শুনিয়া বিস্ময়ে তৃপ্তি বলিল সে কি দাদা ? কেন ?

না বোন ? তোকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারব না।

বল কি দাদা ?

সত্যই বোন তাই—আমার ঘরে তৃপ্তি, বাহিরে তৃপ্তি আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিকণায় তৃপ্তি, অনাহারে অনিদ্রায় তৃপ্তি—আমার অন্তরের মধ্যেও—আর বলা হইল না, একটা জলন্ত উল্কার মত মাতঙ্গিনী আসিয়া বিদ্রুপ স্বরে বলিল, বাঃ রে তৃপ্তি তারপর ক্রোধে চক্ষু তারকা পাকাইয়া বলিয়া উঠিল। নিমকহারাম ! বুকে বসে দাড়ি উপড়ান ? দূরহ এখান হতে। তিন দিন আগে দূর হবার কথা—তাইত বলি এক মুষ্টি অন্ন না পেয়েও কিসের লোভে কিসের আকর্ষণে আজও এখানকার মাটী কামড়ে পড়ে আছে।—বাধা

দিয়া তৃপ্তি বলিল একটু সাবধানে কথা বল মা—আমরা এখানে এমন কোনও দোষের কথা বলি নাই যে তোমার গায়ে বিষ লাগতে পারে।

একে মনসা তাতে আবার ধূনার গন্ধ। একে মাতঙ্গিনী প্রতীবকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য নানারূপ কৌশল জাল বিস্তার করিয়া অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তার উপর তৃপ্তিকে প্রতীবের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া বিশ্বগ্রাসী অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—হারামজাদী, ভিতরে ভিতরে তোদের এতখানি হয়েছে? তোকে না এ ছোড়ার সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেছিলাম! চৌদ্দ বছরের ধাড়ী—আবার চোপা হচ্ছে? এ কথায় প্রতীব আর সহ্য করিতে পারিল না। সেও ঠিক সেইরূপ ভাবেই বলিল ভদ্রলোকের মেয়ে আপনি একটু ভদ্র ভাবেই কথা কইবেন; কারও চরিত্রে কোনও রূপ দোষ দেবেন না। ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধের মধ্যে অন্য কোনও রূপ কলুষিত ভাব আসিতে পারে না।

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া মাতঙ্গিনী উত্তর দিল—কি আমার ভ্রাতা ভগ্নীরে? পরে তৃপ্তির দিকে তাকাইয়া বলিল—চল হারামজাদী! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন তা দেখে নেব বলিয়া তৃপ্তিকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল। তৃপ্তি যাইতে যাইতে প্রতীবকে বলিল তুমি আর এস্থানে একদণ্ডও থেকো না দাদা—আজই চলে যাও—নিজের আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করো না।

প্রতীবও ভাবিল সেই ঠিক—আর কেন? তার চোক দিয়া দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে সে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রতীব সেই যা বাহির হইয়া গেল দুই তিন দিনের মধ্যে আর বাটী ফিরিল না। মাতঙ্গিনীর কথাগুলা আগুনের অক্ষরে তাহার হৃদয়ে গাঁথিয়া রহিল। যে কয়দিন বাটীতে ছিল মনোতোষও তাহার সহিত একটীবার কথা বলে নাই। তাহার উপর মাতঙ্গিনীর কথাগুলা তাহাকে এমন ভাবে উৎপীড়িত করিয়া তুলিল, যে নিজেকে কিছুতেই সুস্থ বোধ করিতে পারিল না, একটা অস্বস্তির ভাব তাহার মনকে সর্ব্বদা আলোড়িত করিয়া তুলিল। যখন সে তাহার হৃদয়কে কিছুতেই শান্ত রাখিতে পারিত না তখন সে গ্রাম প্রান্তরস্থিত শ্যামল দুর্ব্বাদল মণ্ডিত মাখাল তলায় বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় আসিয়া বসিত। ভাবিত যদি প্রকৃতির শান্ত শীতল বায়ু হিল্লোলে প্রাণের অশান্তি একটু কমিয়া আসে, কিন্তু এখানেও কোনওরূপ শান্তি না পাইয়া কেবল অশান্তির কঠোরতাই উপলব্ধি করিত।

মনোতোষ ও মাতঙ্গিনীর কঠোর নির্ম্মম ব্যবহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া যাইত, তাহার মাতা পিতার কথা, মাতার কথা তাহার ততটা মনে আসিত না, কিন্তু পিতার স্নেহ প্রবণ হৃদয়ের অফুরন্ত ভালবাসার স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উঠিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত।

পিতার ও মনোতোষের ব্যবহারের তুলনা করিয়া সে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত। তারপর আবার ভবিষ্যতের চিন্তা আসিয়া এই সমস্ত অতীত চিন্তাকে এলোমেলো করিয়া তুলিত, তাহাদের এই ব্যাবহারের কথা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে কি করিবে এই চিন্তায় বিভোর হইয়া যাইত। কত চিন্তা করিত, আকাশ পাতাল কতকি ভাবিত কিন্তু সে ভাবনার কোনও কূলকিনারা পাইত না। তাহারত সবই আছে অথচ মনে হইত যেন কিছুই নাই। যখন সে কোনওরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না, তখন সে গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক রঞ্জন বাবুর সহিত দেখা করিতে গেল।

রঞ্জন বাবু প্রতীবকে যথেষ্টই স্নেহ করিতেন, তাহার এই প্রথম যৌবনে পুরুষোচিত সবল দেহ, দুর্জ্জয় সাহস এবং অমায়িকতায় রঞ্জন বাবু তাহার উপর যথার্থই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

তাহাকে এইরূপ শুষ্ক মলিন মুখে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কিরে প্রতীব? তোর চেহারা এমন হয়ে গেল কেন?

প্রতীব তাহাকে তাহার অবস্থার কথা খুলিয়া বলিলে এবং ভবিষ্যতের সম্বন্ধে উপদেশ চাহিলে রঞ্জন বাবু বলিলেন, সে সব কথা পরে হবে প্রতীব এখন স্নান করে দুটী আহার করে নে। এত বড় আহাম্মুখ তুই, আজ দুইদিন অনাহারে আছিস অথচ একটীবারও আমার কাছে আসিসনি।

তাহার এই স্নেহ তিরস্কারে প্রতীবের চক্ষে জল আসিল। কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহাকে কোনও কথা বলিতে না দিয়া

রঞ্জন বাবু বলিলেন, এখন কোনও কথা নয় প্রতীব। আহারাদির পর সমস্ত কথা হইবে। সে বলিল, আহারে আদৌ ইচ্ছা নাই মাষ্টার মহাশয়।

তবুও দুটী যা হোক মুখে দিতে হবে বৈকি বাবা—শরীর রক্ষা যে প্রথমেই আবশ্যক!

সে ইহার উপর আর কোনও কথা বলিতে পারিল না, আজ দুই দিন পরে রঞ্জন বাবুর বাটি আহার করিয়া অনেকটা সুস্থ হইল।

আহারাদির পর রঞ্জন বাবু তাহার নিকট একটী একটী করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন দেখ প্রতীব, এ অবস্থায় আর তোমার মনোতোষের বাটী এক দণ্ডও থাকা কর্ত্তব্য নহে।

প্রতীব :—তা হলে এখন আমার কর্ত্তব্য কি বলুন?

রঞ্জন—কেন প্রতীব, তোমার অভাব কি? তোমার যা আছে তাহাতেই যে সুখে স্বচ্ছন্দে বেশ চলিয়া যাইবে। মনোতোষের নিকট পৈতৃক সম্পত্তি বুঝিয়া লইয়া বাস্তভিটা খানি সংস্কার করাইয়া লও। তোমার নিজের সব থাকিতে সব ছাড়িয়া দিয়া কেন দীন দুঃখীর মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াও?

প্রতীব। কিন্তু আমার কি আছে না আছে তাত আমি কিছুই জানি না মাষ্টার মহাশয়!

রঞ্জন। তুমি না জানতে পার প্রতীব, কিন্তু মনোতোষ তা জানে আর গ্রামের অনেকেও তা জানে। তাহাদের সাহায্যে তুমি

তোমার পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পাবার চেষ্টা কর। সে যখন তোমার উপর এতই বিরূপ তখন ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তোমার সম্পত্তি তোমায় বুঝাইয়া দেওয়া তাঁর কর্ত্তব্য।

সে তাহার মাষ্টার মহাশয়ের উপদেশ মাথা পাতিয়া লইল, ভাবিল সত্যইত আমার সব থাকিতে সব ছাড়িয়া কেন দীন হীন ভিখারীর মত ঘুরিয়া বেড়াইব? আমার যা আছে তাই আমার যথেষ্ট, আমি কাকার নিকট আমার সম্পত্তি বুঝিয়া লইব। শৃগাল কুকুরের মত নির্ব্বিব'দে এইরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করা অপেক্ষা আমার যা আছে তাই লইয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।

এই স্থির করিয়া একদিন সে মনোতোষের নিকট তাহার সম্পত্তি ফিরিয়া চাহিল। তাহার এই স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া মনোতোষ ও মাতঙ্গিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং ভিতরে ভিতরে ক্রোধে ফুলিতে লাগিল কিন্তু প্রতীবের কথায় কোনও উত্তর দিল না এবং দিবার কোনও আবশ্যকতা বুঝিল না।

তাহাদিগকে এইরূপ ভাবে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া প্রতীব পুনরায় তাহার সম্পত্তির কথা বলিল। শুনিয়া মাতঙ্গিনী আর স্থির থাকা উচিত নয় দেখিয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, এমন চালবাজি কার কাছে শিখে এসেছিস্? এতদিন দুটী খেতে পেয়েছিস বলে কি সম্পত্তির অংশও তোতে অর্শিয়াছে নাকি? তাহার কথা শুনিয়া প্রতীবের আপাদ মস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, আমি তোমাকে

কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই কাকি, যাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তিনিই এ বিষয়ের উত্তর দিন। শুনিয়া মাতঙ্গিনী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিস তার আর আমার মত কি ভিন্নরে হতভাগা, বেইমান? তোর আবার সম্পত্তি—দূর হ এখনি বাটী হতে, হতভাগা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করতে এসেছে—

প্রতীব আর সামলাইতে পারিল না মনোতোষকে জিজ্ঞাসা করিল, কাকা! আমি আমার সম্পত্তি ফিরিয়া চাই—আপনি দিবেন কি না?

তোমার কিছু থাকলে অবশ্যই দিতাম কিন্তু তোমার ত কিছুই নাই, কথা কয়টী বলিতে মনোতোষের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল, কথা জড়াইয়া গেল।

তাহার কথা শুনিয়া প্রতীব আর স্থির ভাবে দাঁড়াইতে পারিল না। মনে করিল যে পৃথিবীটা তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে; ভীষণ ভূমিকম্পে যেন পৃথিবীটা ঋসিয়া পড়িতেছে, যেন প্রলয়ের জালোচ্ছ্বাসে পৃথিবীটা ভাসিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণের পর নিজকে অনেকটা সংযত করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল আমার পিতার কি কিছুই ছিল না কাকা?

কিছু অবশ্য ছিল প্রতীব! কিন্তু জমিদারের বাকী খাজনার দায়ে তার কতকটা বিক্রয় হয়ে গিয়েছে আর কতকটা অংশ আমার নিকট তোমার পিতা ঋণী ছিলেন বলিয়া বিক্রয় কবলা করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

কাকা—ধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ এখনও আছে, এখনও চন্দ্র সূর্য্য আকাশে উঠছে, এখনও দিন রাত্রি হচ্ছে। আচ্ছা সত্যই যদি আমার কিছু না থাকে তবে আমি চলিলাম কিন্তু নির্ব্বিবাদে এক-জনের সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন ত? মাতঙ্গিনী তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—শুনলেত বাপু তোমার কিছুই নাই আর বেশী জ্বালাতন করনা, আস্তে আস্তে সরে পড়। প্রতীব চিন্তাকুল হৃদয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

পৈতৃক সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্তির আশার পরিবর্ত্তে হৃদয়ের মধ্যে নৈরাশ্যের গভীর বেদনা লইয়া প্রতীব মনোতোষের গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম করিলে, সম্মুখেই তৃপ্তিকে সজল নেত্রে তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাইল। তৃপ্তি রোরুদ্যমানা কণ্ঠে ডাকিল—দাদা ?

কে ? তৃপ্তি ! সবই ত শুনেছিস্ বোন ?

শুনেছি দাদা, হতাশ হয়োনা এখনও ধর্ম্ম আছেন।

ভুল কথা, তৃপ্তি, ধর্ম্ম নাই।

আছে বৈকি দাদা, হয়ত তার প্রথম সোপান অতি কঠোর কণ্টকময়।

ভুল বুঝেছিস তৃপ্তি, একালে তার স্থান অতি নিম্নে—

আর সে বলিতে পারিল না। দ্রুত স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। তৃপ্তি চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আর একদিকে চলিয়া গেল।

প্রতীব মনের মধ্যে দারুণ বেদনা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ওঃ কি সর্ব্বনেশে বিশ্বাসঘাতক এই লোকগুলা, আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করিয়াও এরা এতদিন কেমন বাহ্যিক স্নেহের আবরণে আমায় ঢেকে রেখেছিল। হাঃ ভগবান। সত্যই কি তুমি এখনও আছ ? না সেটা একটা প্রবাদ। তুমি যদি থাকতে তবে কি এত

বড় শঠতা, এত বড় ছলনা তুমি সহ্য করতে পারতে ?—না—না—তুমি নাই—তুমি নাই। এইরূপ চিন্তায় বিভোর হইয়া সে যখন পথে আসিয়া পড়িল তখন একজন ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য পুকুরের অপর পাড়ে এক গৃহস্থের বাটীতে গাহিতেছিল :—

"শুধু মিছে কথা আর ছলনা।"

তাহার চিন্তার স্রোত অন্য দিকে ফিরিল। সত্যই ত! সংসারটা একটা মিথ্যার আগার। কেবল মিথ্যা কথা আর ছলনায় পূর্ণ। এক জনের সর্ব্বনাশ করে তার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করে, এরা সমাজের মেরুদণ্ড হতে চায়। ইহাই এদের ধর্ম্ম, ইহাই এদের কর্ম্ম, ইহাই এদের ধ্যান জ্ঞান। এখানে দয়া নাই, মায়া নাই, স্নেহ নাই, মমতা নাই—আছে কেবল স্বার্থ, আছে কেবল পরের সর্ব্বনাশ, জুয়াচুরি, দাগাবাজি। এইরূপ চিন্তায় বিভোর হইয়া সে রঞ্জন বাবুর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে গেল। তাহাকে দেখিয়াই রঞ্জন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—দেখা করেছিলে প্রতীব ?

গাঢ়স্বরে প্রতীব উত্তর দিল—আজ্ঞে হাঁ মাষ্টার মশায়।

রঞ্জন—তা হলে তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি সে তোমায় ফিরে দেবে ত ?

বিষাদ হাস্যে ছল ছল নেত্রে প্রতীব বলিল—আমার ত কিছুই নাই মাষ্টার মশায়।

শুনিয়া রঞ্জন বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেলেন—এও

কি সম্ভব ? বিস্মিত ভাবে বলিলেন, কি বল্‌ছ প্রতীব ? কে বল্লে তোমার কিছুই নাই ?

প্রতীব—কাকাবাবু নিজেই বলেছেন। আমার বাবার কিছু ছিল বটে, কিন্তু বাকি খাজনার দায়ে জমিদার তার কতকটা নিলাম করে নিয়েছেন ; আর কতকটা আমার বাবা তাঁর কাছে যে দেনা করেছিলেন তার জন্য বিক্রি করে গিয়াছেন।

মনোতোষ যে এইরূপ উত্তর দিবে, তাহার জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না—শুনিয়া বলিলেন, বটে, মনোতোষ তাহলে ঠিক কালের মত কাজ ক'রেছে। যাক এখন এবিষয় গ্রামের সকলকে একবার জানান দরকার। প্রতীব, তুমি একবার সকলকে বলে দেখ।

বিষাদ-মাখা স্বরে প্রতীব বলিল, গ্রামে মানুষ আর কে আছে মাষ্টার মহাশয় যে, কাকা বাবুর বিরুদ্ধে একটী কথা বলতে সাহস করবে ; যাঁরা ছিলেন তাঁরা ত এদের দয়ায় দেশত্যাগী।

তবুও একবার বলা দরকার প্রতীব, বিশেষতঃ বিনোদ চক্রবর্ত্তী, গুপী ঘোষাল ও সুরেন ঘোষকে বলা দরকার—তুমি একবার তাদের কাছে যাও। যদি তারা কিছু ক'রতে পারেন।

প্রতীব—তাতে কি কিছু ফল হবে মাষ্টার মহাশয় ?

রঞ্জন—ফলাফল নির্ণয় এখনই কে করবে প্রতীব ?—একটা বেশ পাকা রকম বড়যন্ত্র না করে কি আর মনোতোষ তোমাকে এমন ভাবে উত্তর দিয়েছে ?

তবে !

তবুও একবার বলা দরকার, তুমি যাও, আমিও একবার তাদের সহিত দেখা করিয়া যাহাতে তোমার কিছু সুবিধা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিব।

তাঁহার কথা মত প্রতীব গ্রামের সকলের নিকট মনোতোষের ব্যবহারের কথা জানাইল, কিন্তু জানাইলে কি হইবে? সে যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহাই হইল। কেহই মনোতোষের বিপক্ষে কোনও কথা বলিতে সাহস করিল না। কেহ বলিল, মনোতোষের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিতে পারিব না। গ্রামের মধ্যে তাহার যেরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তাহাতে কে আর জলে বাস করিয়া কুমিরের সহিত বিবাদ করিবে? কেহ কেহ বলিল, মনোতোষের নিকট তাহারা অনেক টাকা ঋণী; এ অবস্থায় কিরূপে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে? কেহ বলিল, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ানও যা আর গ্রামে বাস করিবার আশা পরিত্যাগ করাও তাই।

তাহাদের এইরূপ দৌর্ব্বল্য দেখিয়া প্রতীবের প্রাণ ঘৃণায়, লজ্জায় পূর্ণ হইয়া গেল। এত বড় দুর্ব্বল এরা, যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটা কথা বলবার সাহসও ইহাদের নাই। ইহাদের এইরূপ উত্তর শুনিয়া গোপী, সুরেন, ও বিনোদের নিকট যাইবার তাহার আর আদৌ প্রবৃত্তি হইল না। মনে ভাবিল, তাহাদের নিকট ইহার অধিক আর কি আশা করিতে পারি? তাহারাও ত এই গ্রামেরই লোক! কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের আদেশ

ইহাদিগকে একবার নিজের অবস্থা জানাইতেই হইবে—তাই সে সুরেনঘোষের নিকট যাইয়া মনোতোষের ব্যবহার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল। শুনিয়া সুরেন বলিল বল কি বাবাজি! এত বড় ডাকাতি মনু কর্ত্তে পাল্লে? এতটা অধর্ম্ম সহ্য হবে কি?

তাহার এই সহানুভূতি দেখিয়া প্রতীব ছল ছল নেত্রে তাহাদের সাহায্য ভিক্ষা করিল। শুনিয়া সুরেন পরমাত্মীয়ের মত বলিল, ভব দাদার ছেলে তুমি,—তুমি পথে বসবে আর আমরা তাই দেখব? তাকি কখনও হয়, বাবাজি? তুমি জাননা আর জানলেও মনে পড়বে না, তোমার বাপের খেয়েই আমরা মানুষ হয়েছি। তাহার এতটা সহানুভূতি দেখিয়া প্রতীব তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল —মনে করিল এত লোকের নিকট নিজের অবস্থা জানাইলাম, কৈ? তাহারা আমার পক্ষ লইয়া এতটুকু কথাও বলিল না। তাহাকে এইরূপ ভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া সুরেন বলিল, এত কি ভাবছ বাবাজ, চল দেখি একবার বিনোদ ও গোপীর নিকট যাই—এ বিষয়ে তাহাদের সহিত পরামর্শ প্রয়োজন।

প্রতীবকে লইয়া সুরেন, বিনোদ ও গোপীর নিকট উপস্থিত হইল। প্রতীবের অবস্থার কথা শুনিয়া বহুক্ষণ আলোচনার পর আদালতের সাহায্য গ্রহণ করাই তাহাদের মতে মঙ্গল জনক বলিয়া মনে হইল। শুনিয়া প্রতীব বলিল—মামলা চালাইবার মত আমার অর্থ কোথায়?

গোপী বুদ্ধিমানের মত বলিল, চেষ্টা কর বাবাজি, চেষ্টা কর—আদালতের সাহস ভিন্ন এরূপ অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার কিছুতেই হইবে না। আশ্রয় লইলে বরং সম্পত্তি ত ফিরিয়া পাইবেই, উপরন্তু প্রতারণার অভিযোগে কিছু দিন তাহাকে শ্রীঘর বাস করিয়া আসিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তেমনি তার উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে।

মাষ্টার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় করিব বলিয়া প্রতীব ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার চিন্তার শেষ নাই, সীমা নাই। আদালতের সাহায্য ভিন্ন তাহার পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কোন আশাই নাই, অথচ আদালতের সাহায্য লইলে অর্থের প্রয়োজন, এ অর্থ ই বা সে পাইবে কোথায়? তাহার এমন অবস্থায় কেই বা তাহাকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে? আর অর্থের কিনারা যদিও হয় তাহার পক্ষ লইয়া সুরেন, গোপী, ও বিনোদ ছাড়া এ গ্রামের কেহই সাক্ষ্যরূপে দাঁড়াইবেন না। এ অবস্থায় মামলার ফলাফল যাহা হইবে তাহা তাহার বিরুদ্ধে, ইহা একরূপ স্থির নিশ্চয়। এ অবস্থায় মামলা করিয়া ফল কি? তবে উপায় কি? এইরূপ এক একটী চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া তাহার হৃদয় মথিত করিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে মসীময় করিয়া দিল। একবার সে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, অন্ধকার, কেবলই অন্ধকার। তাহার ভবিষ্যৎ জীবন ও এইরূপ গাঢ় অন্ধকারময়। চিন্তায় বিভোর হইয়া সে গ্রাম-

প্রান্তরস্থিত শ্যামল-দুর্ব্বাদল-পূর্ণ-মাখাল তলার দিকে অগ্রসর হইল। গ্রামের কাহারও বাটীতে সে আশ্রয় লইতে পারিত কিন্তু তাহাদের ব্যবহারে আর তাহাদের বাটীতে যাইতে ইচ্ছা হইল না। এখন বৃক্ষতলই আশ্রয় ভাবিয়া মাখালতলায় বটবৃক্ষমূলেই রাত্রিটা কোনওরূপে কাটাইয়া দিবে বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে শুনিল, একটী বালক তাহার পাঠ মুখস্থ করিতেছে :—

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ।
উত্তম বিহনে কিবা পূরে মনোরথ॥
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?

তাহার চিন্তার স্রোত অন্য দিকে ফিরিল। সত্যইত! উত্তম ভিন্ন কি কাহারও মনোরথ পূর্ণ হয়? কিন্তু সে উত্তম কিরূপে দেখাইব? আমি এমন কপর্দ্দক শূন্য, বৃক্ষতল আমার আশ্রয়, এই অবস্থায় উহাদের কথা মত কাকা মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উত্তম দেখাইব, না অন্য কোনও উপায়ে—কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মাখালতলায় এক বটবৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। চারি দিকে গাঢ় অন্ধকার—মাথার উপর আকাশে উচ্চে—অতি উচ্চে তারকা পুঞ্জ ঝিকিমিকি করিতেছে। আশে পাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ প্রকাণ্ড দৈত্যের মত মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিন দিকের নির্জ্জন প্রান্তর হইতে ক্রমাগত ঝিল্লিরব উঠিয়া তাহার নিরাশ অন্তরটাকে আরও নিরাশ করিয়া

তুলিল। এক একটী চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল, এক একবার ভাবিতে লাগিল, কাকা মহাশয়ের বিরুদ্ধে আদালতে নালিস করি। তারপর আবার ভাবিতে লাগিল, কি হবে এই ছাই বিষয়ে? মানুষ যখন নিজেই চিরজীবি নয়—আমি যখন চিরদিন এই বিষয় ভোগ করিতে পারিব না, সব থাকিতে সব ফেলিয়া যখন আমায় একদিন চলিয়া যাইতেই হইবে তখন কেন আর তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা করিয়া একটা অশান্তির আগুণ জ্বালিয়া দিই। না তার প্রয়োজন নাই। আমি বিষয় উদ্ধারের জন্য কাকামহাশয়ের সহিত বিবাদ করিয়া আমার স্বর্গগতা স্নেহময়ী কাকিমার ক্ষোভের ও দুঃখের কারণ হইতে পারিব না। সমস্ত তিনিই ভোগ দখল করুন। আমি আমার অদৃষ্টের অনুসন্ধানে এ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু কোথায়? কিরূপে আমার অদৃষ্টের যবনিকা উত্তোলন করিব?—এইরূপ নানা চিন্তায় সে যখন মগ্ন, তখন শুনিতে পাইল তাহার পরিচিত কণ্ঠে ভগবান বাগ্দি গাহিতেছে :—

"দুনিয়াটা যে গোলক ধাঁধাঁ মায়ায় বাঁধা ত্রিসংসার
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি তুমি কার কে তোমার" ॥

সত্যই তাই, এই ত্রিসংসার মায়ায় বাঁধা। এই মায়া প্রপঞ্চে কাকা, দাদা, মা, বাবার সং সেজে সকলেই সকলের আপনার। তারপর যখন চিরদিনের জন্য চক্ষু বুজিবে তখন আমিই বা কার, আর কেই বা আমার? সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, ভগবান কাকা! ভগবান কাকা!!

ভগবান তখন গাহিতেছিল :—

আতর গোলাপ সাবান মেখে
কর্‌ছ দেহ জেয়ান্ত সার,
এই দেহ ভাই কবর যাবে
শৃগাল করবে মাংসাহার ॥

ভগবান তিন দিন প্রতীবকে না দেখিয়া তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছিল। এই জনশূন্য স্থানে তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, এই যে ছোটবাবু। এমন সময় এখানে কেন ?

এখন এই গাছতলাই আমার আশ্রয় ভগবান কাকা।

কি রকম।

প্রতীব তখন একটী একটী করিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া রাগে ভগবানের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, বলিল সুরেন, গোপী ও বিনোদবাবু যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক ছোটবাবু, তবে তোমার বদলে তাকেই ফরিয়াদিরূপে দাঁড়াইতে হইবে, তোমার সম্পত্তি তুমি বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লও।

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতীব বলিল, তা কি করে হয় ভগবান কাকা ? আমার লোক বল কোথায় ?

ছোটবাবু, তোমার বাবার অনেক খাইয়াছি। তার ছেলে তুমি, একজনের অত্যাচারে দেশত্যাগী হবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখব ? তোমার কোনও ভয় নেই, ছোটবাবু। তোমার এই ভগবান কাকা একবার লাঠি ধরে দাঁড়ালে শুধু মনোতোষ কেন এ গাঁয়ের

এমন একটা লোক নেই, যে তোমার বিরুদ্ধে লাঠি ধরে? শুনিয়া প্রতীব শিহরিয়া উঠিল, ছিঃ, ছার বিষয়ের জন্য তাহার প্রতিপালকের বিরুদ্ধে লাঠী ধরিবে? প্রকাশ্যে বলিল, না কাকা, তা আমি কিছুতেই পারিব না।

ভগবান—সেকি ছোটবাবু? তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে এতগুলা সম্পত্তি হাত ছাড়া কর্‌বে?

প্রতীব—এইমাত্র না তুমি গাহিতেছিলে কাকা 'মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি, তুমি কার কে তোমার।' তবে মিছামিছি সামান্য বিষয়ের লোভে পূজনীয় পালকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া একটা মহাপাপের আয়োজন করি কেন?

ছোটবাবু।

তোমার কোনও কথা শুনব না ভগবান কাকা—আমাকে কেহই সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। আমি আমার অদৃষ্টের সন্ধানে একবার বাহির হইব—কালই বাহির হইব। ভগবান যদি কখনও দিন দেন তবে আবার তোমাদেরই কোলে ফিরে আসব। কাকা কিছু মনে করো না।

হাগা—ছোঁড়াটা নাকি গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে ?

হাঁ তাইত শুনলাম, রঞ্জনবাবু সকালে এসেছিলেন।

কেন ?

প্রতীবের পৈতৃক সম্পত্তিগুলা তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য।

শুনিয়া মাতঙ্গিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, তাই নাকি ? তা তুমি কি বল্‌লে ?

এর আর বলাবলির কি আছে মাতু। সম্পত্তি এখন আমার। দান খয়রাত করবার মত সাহস এখনও আমার হয় নাই। তবে রঞ্জনবাবুর একটা অনুরোধ আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে।

কি সে অনুরোধটা গা ?

তিনি ধরেছেন, ছোঁড়াটাকে মাথা গুঁজে থাকবার মত তার ভিটাখানি অন্ততঃ তাকে দিতে হবে।

মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল—হুঁ।

মনোতোষ বলিতে লাগিল, সত্যই মাতু ! সেই অবধি আমায় বেশ ভাবিয়ে দিয়েছে। হাজার হৌক বাল্যকাল হতে তাকে মানুষ করেছি, আবার তার সর্ব্বনাশও যথেষ্ট করেছি। তার কিছুরই অভাব ছিল না যার জন্য তাকে দেশত্যাগী হতে হয়।

মাতঃ—তবে তুমি কি বলতে চাও, তার ভিটাখানি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এই গ্রামে তাকে বসবাস করবার সুযোগ দবে? তাতে কি তোমার শত্রু বাড়বে না মনে কর?

মনোঃ—বাড়বে না এমন কথা আদৌ মনে করতে পারিনি মাতু।

মাতঃ—তবে?

মনোঃ—তবে কি জান, কেহ ভয়ে বলুক আর নাই বলুক তোমার আমার ত আর অজানা নাই কি সর্ব্বনাশটা তার করেছি। যদি ভিটাখানি তাকে ফিরিয়ে দিই তাহলে হয়ত সে তা লয়েই সন্তুষ্টচিত্তে বসবাস করতে পারবে—সহস্র সুযোগ তার সম্মুখে এলেও আমার বিরূদ্ধে মাথা তুলে সে দাঁড়াবে না।

মাতঃ—কিরূপে জানলে?

মনোঃ—আশৈশব তাকে যে দেখে আসছি মাতু। তার স্বভাব যেরূপ তাতে মনে হয় বাস্তুভিটাটুকু পাইলেই সে সন্তুষ্ট হইয়া অন্যান্য সম্পত্তির কথাও ভুলে যেতে পারবে।

শুনিয়া মাতঙ্গিনী হাঁ কি না কোনও কথা বলিল না। নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মনোতোষ বলিতে লাগিল—গ্রামের সকলেই জানিত ভবতোষ মৃত্যুকালে বিস্তর ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে। আজ তার পুত্র পথের ভিখারী, এ অবস্থায় ভিটাখানি পর্য্যন্ত যদি তাকে না ফিরিয়ে দিই, তবে সকলেই এই চক্রান্তের কথা জানিতে পারিবে। এখনই ত অনেকে একথা বলাবলি করিতেছে।

মাতঙ্গিনীঃ—সেইজন্যই আরও আমার ইচ্ছা ভিটাখানি পর্য্যন্ত তাহাকে না দেওয়া, দেখি সে কোথায় কাহার আশ্রয়ে থাকিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

তাহাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দিয়া প্রতীব আসিয়া ডাকিল, কাকাবাবু? তাহার ডাক শুনিয়া উভয়েই একটু চমকাইয়া উঠিল। প্রতীব কিন্তু উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাহাদিগের নিকট আসিয়া ছলছল নেত্রে বলিল, কাকাবাবু! আজ আমি কলিকাতায় যাইব—আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিলাম। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

মনোতোষের অন্তরটা ইহা শুনিয়া কেমন একরূপ আলোড়িত হইয়া উঠিল। অন্যের প্ররোচনায় সে প্রতীবের উপর যত বড় নিষ্ঠুরই হইয়া উঠুক না কেন—সে যে এই ছেলেটাকে বাল্যকাল হইতে লালনপালন করিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছে। আজ তাহার প্রাণের অন্তঃস্তল হইতে একটা অবসাদের ভাব আসিয়া দেখা দিল। তাহার মৃত বন্ধুর মৃত্যু শয্যায় শপথের কথা মনে হইল, কিন্তু মনে পড়িলে কি হইবে সে যে এখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তা হতে প্রত্যাবর্ত্তন করা সহজ সাধ্য নয়; জিজ্ঞাসা করিল, কলিকাতায় কেন যাবে প্রতীব? তাহারও স্বর গাঢ়।

নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য কাকাবাবু। এই বলিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। মনোতোষ কোনও কথা বলিতে পারিল না। তবে আমি আসি, কাকীমা! বলিয়া মাতঙ্গিনীর পদধূলি লইতে

অগ্রসর হইলে, মাতঙ্গিনী সেস্থান হইতে সাত হাত পিছাইয়া যাইয়া বলিল, থাক্ বাছা অততে আর কাজ নাই।

প্রতীব অন্তরে বিষম আঘাত পাইয়া বলিল—জনমের মত ত এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্চি কাকীমা—আর কখনও যে এ গ্রামে ফিরে আসব তার আশাও নেই, তবে আর কেন এখনও আমার উপর আপনি রাগ কর্‌ছেন। আপনার একটু পায়ের ধূলা দিন, ক্রোধ দূর করে আশীর্ব্বাদ করুন কাকিমা—যেন আমি আমার অভিষ্ট পথে অগ্রসর হতে পারি।

মুখ ভার করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, সে আশীর্ব্বাদ আমি কর্‌ছি বাছা—আমায় প্রণামে আর আবশ্যক নাই। প্রতীব ইহার পর আর তাহাকে কোনও কথা বলিল না—মনোতোষকে বলিল, তবে আমি আসি কাকাবাবু। মনোতোষ প্রকাশ্যে কোনও কথা বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, এস। প্রতীব ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিয়দ্দূর যাইলে মনোতোষ ডাকিল প্রতীব!—

প্রতীব ফিরিয়া আসিলে, মনোতোষ এক গোছা চাবির মধ্য হইতে তিন চারিটা চাবি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, তোমার বাটীর চাবীগুলি লও। সহসা মনোতোষের ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রতীব বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে এইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইতে দেখিয়া মনোতোষ বলিল, প্রতীব! তোমার পিতার সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে তাহা তুমি জান। তোমার বাটীখানি আমি কিনিয়া

লইয়াছিলাম, তোমার বাসের জন্য সেই বাটীখানি আমি তোমাকেই দান করিলাম। চাবীগুলি নিয়ে যাও, পরে লেখাপড়া করে দেব।

প্রতীব পুনরায় তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, কাকাবাবু এতটাই যদি দয়া করলেন, তবে অনুমতি করুন যাবার সময় একবার তৃপ্তিকে দেখিয়া যাই। মনোতোষকে কোনও কথা বলিতে না দিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, না বাছা—সে এখন বাটী নাই।

এ কথার পর সে আর কি বলিবে। বিষাদ মলিন মুখে ধীরে ধীরে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মনোতোষ নির্ব্বাকভাবে তাহার গমন পথ লক্ষ্য করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রতীব গৃহপ্রাঙ্গনে আসিয়া একবার চারিদিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিল যদি কোনওরূপে তৃপ্তিকে একবার দেখিতে পায়। দেখিল তৃপ্তি একটী গৃহের দাবায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুবন্যা বহিয়া যাইতেছে। তাহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া প্রতীব নিজেকে দমন করিতে না পাইয়া ডাকিল—তৃপ্তি!

তৃপ্তির কর্ণে এই ডাক পৌছিতে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। একরূপ ছুটিয়াই তাহার দিকে অগ্রসর হইল। মধ্য পথ অতিক্রম করিতে না করিতে মাতঙ্গিনী বজ্র কঠোর কণ্ঠে ডাকিল, তৃপ্তি! সে ডাক গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া, তৃপ্তি প্রতীবের নিকট উপস্থিত হইল। প্রতীবেরও চক্ষু দিরা জল পড়িতেছে। তৃপ্তি তাহাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোমার এই ছোট

বোনটিকে ভূলনা দাদা। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রতীব বলিল, তোকে কিরূপে ভুলব বোন—তুই যে আমার হৃদয়টাকে দখল করে রেখেছিস্। বলিতে বলিতে দেখিতে পাইল মাতঙ্গিনী রক্ত চক্ষু বাহির করিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রতীবকে অপমানের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তৃপ্তি, তবে এস দাদা বলিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। প্রতীব তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

এতখানি বয়স পর্য্যন্ত প্রতীব কখনও গ্রামখানির বাহিরে যায় নাই, মাত্র কয়েক দিনের জন্য সে 'মাতৃকুত্রসন' পরীক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঞ্জন বাবুর সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিল। আজ সেই গ্রাম খানিকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার হৃদয়ে এক দুর্ব্বিসহ বেদনা অনুভব করিল। এতখানি বয়স পর্য্যন্ত সে এই গ্রামখানিকে আপনার বলিয়াই চিনিয়াছিল; কখনও ধারণা করিতে পারে নাই যে, এক দিন তাহাকে এই সাধের গ্রাম-খানি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। আজ সেই ধারণার অতীত জিনিষটাকে বাস্তবে পরিণত হইতে দেখিয়া তাহার বক্ষপিঞ্জর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল। জানিনা সে দীর্ঘ-নিশ্বাসের কিয়দংশও মনোতোষের অন্তঃকরণে দাগা দিতে পারিয়াছিল কিনা।

মনোতোষের নিকট হইতে পিতৃগৃহের চাবি পাইয়া সে প্রথমেই তার ভিটাখানিতে আসিয়া যে ঘরখানিতে তার পিতা শয়ন করিতেন সেই ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিতেই প্রাচীরের সম্মুখগাত্রে দেখিল তাহার পূজনীয় পিতামাতার তৈলচিত্র যেন সহাস্যে তাহার দিকেই চাহিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

দেখিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিল, বাবা! বাবা!! তারপর তাঁহাদের

উদ্দেশে ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল বাবা! আজ আপনার বিশ্বাসী কাকা বাবুর দয়ায় আমি দেশত্যাগী, আশীর্ব্বাদ করুণ বাবা যে উদ্দেশ্য লয়ে আজ এই গ্রামখানি ছেড়ে যাচ্চি সে অভিষ্ট যেন পূর্ণ হয়। আজ দীন হীন পথের ভিখারি হয়ে গ্রামখানি ছেড়ে যাচ্চি, যেন আবার তোমাদেরই পুত্র হয়ে এই গ্রামখানিতে ফিরে এসে তোমার ভিটায় সাঁজের প্রদীপ জ্বালিতে পারি।

প্রতীব ধীরে ধীরে গৃহখানি হইতে বাহির হইয়া তাহাতে চাবি বন্ধ করিয়া বাটী হইতে যখন বাহির হইয়া পড়িল তখন গ্রামের ঘরে ঘরে সন্ধ্যার বাতী জ্বালাইয়া পুরাঙ্গনাগণ শঙ্খধ্বনি করিতেছে। ওপাড়ায় বসুদের বাটীতে বাস্তু দেবতার আরতির কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। তারপর প্রতীব তার ভগবান কাকা ও মাষ্টার মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া গ্রামখানি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় ভগবান বাগ্দি তাহাকে দশটী টাকা দিয়া দিল। প্রথমে প্রতীব এই টাকা লইতে অস্বীকার করিলে, ভগবান চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে এমন ভাবে তাহার হাতে টাকা কয়টী গুজিয়া দিল, যাহাতে সে আর কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিল না।

যখন সে তেলকল ঘাট ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিল, তখন তাহার এক বিষম ভাবনা হইল। এখন সে কোথায় যাইবে ও কি করিবে? তিন চারি দিন তাহার পথে পথে কাটিল। একটু আশ্রয় বা সহানুভূতি পাইবার প্রত্যাশায় সে পথে পথে ঘুরিয়া

বেড়াইল, কিন্তু কেবল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলে ত আর কাহারও সহানুভূতি লাভ করা যায় না। এই নিরীহ পল্লি যুবকটী এক দিকে যেমন সাহসী, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন, অন্য দিকে তেমনি অত্যন্ত লাজুক ও কোমল হৃদয়। এরূপ বিভ্রান্ত ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া যদি কাহারও বাটীতে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিত, তবে হয়ত বা কোনও সদাশয় ভদ্র লোকের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিত, কিন্তু প্রতীব তাহা পারিল না। এক একবার মনে ভাবিত কাহারও আশ্রয় প্রার্থনা করে,—কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাহাকে এমন ভাবে জড়িত করে, যে, সে আর তাহা পারিয়া উঠে না। এই ভাবে তাহার তিন চারি দিন কাটিয়া গেল, কাহারও বাটী আশ্রয়ের জন্য চেষ্টা করিল না। এ কয় দিন পেটে অন্ন নাই। চক্ষে নিদ্রা নাই; ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, বৃক্ষতলে আশ্রয়।

এই ভাবে পাঁচ সাত দিন কাটিবার পর এক দিন ঘটনাক্রমে এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সে দেখিতে পাইল একটী সমিতিতে অনেকগুলি বালক ও যুবক লাঠি, বর্শা, সড়কি প্রভৃতি খেলা তাহাদের শিক্ষকের নিকট আয়ত্ত করিতেছে। শিক্ষক মহাশয়ও ঐকান্তিক যত্নে তাহাদিগকে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিতেছেন; দেখিয়া তাহার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সে যে ইহাই চায়, অম্লজীর্ণ দুর্ব্বল বাঙ্গালী যুবককে দৈহিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে দেখিলে তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে; তাই সে আজ এত গুলি লোককে খেলায় মাতিয়া

থাকিতে দেখিয়া আপনভোলা হইয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিল।

শিক্ষক মহাশয় দুই তিনটা বালককে বল্লম ক্রীড়ার কৌশল দেখাইয়া দিতেছেন। বালকগণও মনোযোগসহকারে তাহা শিক্ষা করিতেছে প্রতীবের মনে হইল যেন শিক্ষক মহাশয়ের বল্লম চালনার কৌশলের মধ্যে কোথায় একটু ভুল থাকিয়া যাইতেছে বা তিনি ইচ্ছা করিয়াই সেই কৌশলটুকু গোপন রাখিতেছেন। যে কারণেই হৌক শিক্ষকের পক্ষে ইহা অতীব অন্যায় এবং লজ্জাজনক বিবেচনা করিয়া সে আবেগময় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এটা ত ঠিক হচ্চে না ম'শায়।"

একজন অপরিচিত যুবকের এই ভাবে প্রথম সম্ভাষণ সকল কেই চমকিত করিয়া দিল; সকলেই এই আগন্তুকটীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। সমিতির শিক্ষক বিজলি বাবু একজন গুণ গ্রাহী উদার যুবক। তিনি প্রতীবের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত দুইটী ধরিয়া বলিলেন, বেয়াদপি ক্ষমা করবেন, আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? প্রতীব ও স্ফীত হাস্তে নম্রভাবে তাহার নাম বলিল।

বিজলি বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিবাস? এবার উত্তর দিতে প্রতীবের কণ্ঠ রূদ্ধ হইয়া আসিল, চোখের কোনে জল আসিয়া চক্ চক্ করিয়া উঠিল। সে যে তাহার আদরের জন্মস্থান চির দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। তথাপি

একটু উত্তর দিতে হইবে, তাই সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, উপস্থিত আমার নিবাস কোথাও নাই, আমি গৃহ হারা আশ্রয় শূন্য দীন হীন পথের ভিখারী।

বিজলি বাবু চকিতের মধ্যে কি ভাবিয়া লইলেনও বলিলেন ; আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, না বুঝে অনর্থক আপনার প্রাণে কষ্ট দিয়াছি।

কিছু নয় মহাশয় বরং আমার সৌভাগ্য যে ভগবানের দয়ায় আপনার মত লোকের সহিত পরিচিত হইতে পাইয়াছি, এইটাই আমার অশেষ লাভ।

বিজলি বাবু এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, প্রতীব বাবু বুঝেছি, আপনি বল্লম চালনায় সুদক্ষ, যদি কিছু মনে না করিয়া আমার সহিত একটু খেলেন তবে খুবই সুখী হব।

প্রতীব—আপনার সহিত খেলা আমার সৌভাগ্য বলে জানব। তবে এ খেলাটা আমার বেশ ভালরূপ জানা নাই।

বিজলি।—যা জানেন আমার বোধ হয় তাই যথেষ্ট ; অগ্নি কখনও ভস্ম দিয়া চাপা থাকে না।

প্রতীব বিজলি বাবুর হাত ধরিয়া সহাস্যে অগ্রসর হইল। গাত্র হইতে অঙ্গরাখা উন্মোচন করিয়া মল্ল্যের বেশ ধারণ করিল। উভয়েই উভয়ের ললাটে বৃহদায়তনের সিন্দুরের ফোটা পরিল, তারপর পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া উদ্দেশে গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক পরস্পরের সম্মুখিন হইল। উভয়ের হস্তে নিমিষ মধ্যে বল্লম ঘুরিয়া

উঠিল, উভয়েই বল্লম চালনায় সিদ্ধ হস্ত। সমিতির সভ্যগণ যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে উদ্বেলিত হৃদয়ে তাহাদের ক্রীড়া কৌশল দেখিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে কাহার ও জয় পরাজয়ের লক্ষণ নির্ণীত হইল না। উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, কি সুন্দর এই আগন্তুকের বল্লম চালনার ভঙ্গী,—কিন্তু আর বুঝি পারে না, এবার গুরুজীর জয় অবশ্যম্ভাবী। আনন্দে গর্ব্বে তাহাদের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় গুরুজীর জয়।

কিন্তু একি? তাহাদের উল্লাসধ্বনি থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতীব একটী হাত তুলিয়া বলিল, বাস, খেলা শেষ বিজলি বাবু, আপনি পরাজিত। সভ্যগণ বলিয়া উঠিল, কিরূপ? খেলা এখনও শেষ হইল না জয় পরাজয় কিরূপে নির্ণীত হইল?

বহুক্ষণ পূর্ব্বেই তাহা নির্ণীত হইয়াছে।

কি রূপে?

প্রতীব তখন সহাস্যে বিজলী বাবুকে বলিল, দেখুন দেখি আপনার ললাটে সে সিন্দুর বিন্দু আছে কিনা?

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সত্যই ত সকলের অলক্ষ্যে এমন কি বিজলি বাবুর অজানিত ভাবে সেই সিন্দুরের ফোঁটা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রতীব তখন তাহার হস্তধৃত বল্লমের অগ্রভাগ দেখাইল, তাহাতে সেই সিন্দুর লাগিয়া আছে। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ নির্ব্বাক হইয়া গেল।

বৌভাত

গুণগ্রাহী বিজলি বাবু নিজের পরাজয়ের কথা, লজ্জার কথা ভুলিয়া গেলেন, হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া পুনরায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আপনাকে আমি বহু পূর্ব্বেই চিনিয়াছি। আপনাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম আপনি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি—আমি আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছি, প্রতীব ও বিনয় নম্র বচনে বলিল, আপনি ও বড় কম নন বিজলি বাবু, এ কৌশল অনেকেই জানে না! আমার গুরুদেব অত্যাধিক স্নেহবশে আমায় এইটুকু শিখাইয়াছেন।

বিজলি বাবু বলিলেন, যাই হৌক প্রতীব বাবু! আজ আপনার নিকট পরাজিত হইয়াও যে কি আনন্দ হচ্ছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম, দয়া করে আজ আমার বাটীতে আপনাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

সেটাকে নিজের সৌভাগ্য বলেই মনে করব।

সেই দিনকার মত সমিতির কাজ বন্ধ রাখিয়া প্রতীবকে লইয়া বিজলিবাবু নিজের গৃহে লইয়া গেলেন।

এই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীটীকে পাইয়া বিজলিবাবুর আনন্দ আর ধরে না। দুই তিন দিন লাঠী শড়কি প্রভৃতি চালনার নানারূপ কৌশল দেখিয়া বিজলিবাবু প্রতীবের উপর এমনই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, যে, শেষে তিনি নিজেই প্রতীবকে এই সমিতির শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রতীব কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে তাহাদিগের আন্তরিক আগ্রহ, একান্ত অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে না পারিয়া, বিশেষ বিজলিবাবু যখন বলিলেন এতদিন লোকের অভাবে আমাকে বাধ্য হইয়া ইহাদিগের শিক্ষকতা করিতে হইয়াছিল—আমার কার্য্যের গুরুত্ব এত অধিক, যে, সে সমস্ত ঠিক মত দেখিয়া এখানে প্রত্যহ আসা আমার পক্ষে অসাধ্য। তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে হইল।

ঐ পদ গ্রহণ করিয়া প্রতীব এমন সুন্দর ও শৃঙ্খলার সহিত শিক্ষার্থীদিগকে ক্রীড়া কৌশল শিক্ষা দিতে লাগিল, যাহাতে সদস্যগণ তাহার প্রতি মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই হাওড়ায় তাহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। তাহার সরল অমায়িক ব্যবহারে, অন্যের বিপদে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়াও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি গুণাবলীতে সে সকলের প্রাণের পরতে

পরতে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ ইচ্ছা করিয়া সহজে তাহাকে সেস্থান হইতে চ্যুত করিতে চাহিত না।

যে প্রতীব অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে পিতৃবন্ধু পিতৃব্য তুল্য মনোতোষের চক্রান্তে আশ্রয়হারা সহায়শূন্য হইয়া ভগবান প্রদত্ত দশটী টাকা সম্বল করিয়া নিজের অদৃষ্টের অনুসন্ধানে অনাহারে অনিদ্রায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, সেই প্রতীব আজ ভগবানের অসীম অনুগ্রহে হাওড়াবাসীর অন্তরে কেমন "আপনার লোকের" মত জুড়িয়া বসিল। তাহার সামান্য অসুস্থ সংবাদ কোনওরূপে কাহারও কর্ণে পৌছিলে তাহারা দিবা রাত্র তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিত না, যেন তাহাদের নিজের ভ্রাতা বা পুত্রের অসুখ বলিয়াই জ্ঞান করিত। মোহান্ধ জীব আমরা, আমরা তাঁহার এই অসীম লীলার কথা ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরি—একে অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে সর্ব্বদাই প্রয়াস পাই কিন্তু এব জন আছেন বুঝিতে পারি না, যাহার অদৃশ্য মঙ্গল হস্ত অত্যাচারক্লিষ্ট লোকটীকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই সকল সময়েই সম্প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে—আমরা এমনি মোহান্ধ পাটোয়ারি জীব।

এমনিভাবে সকলের আদর যত্নের মধ্যে প্রতীবের দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। এতটা আদর যত্নের মধ্যে থাকিয়াও প্রতীব কিন্তু একটা বিষয় ভুলিতে পারিত না এবং সেইটাই তাহাকে বেশী আঘাত দিত, যে, সে এখনও অন্যের দয়াদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট

হইতেছে। এইটা যখনই তাহার মনের মধ্যে উদয় হইত তখনই কেমন একটা অশরীরী বেদনা তাহার হৃদয় পঞ্জর চূর্ণ করিয়া দিত, কিন্তু উপায় কি? যতক্ষণ সে বালকদিগকে ক্রীড়া কৌশল শিক্ষা দিত, ততক্ষণ সে আপন ভোলা হইয়া থাকিত, কিন্তু দিবা দ্বিপ্রহরে ও রাত্রিতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটীর পর একটী চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয় মথিত করিয়া তুলিত। নিজের অবস্থার কথা ত বটেই উপরন্তু আর একজনের চিন্তা সে এড়াইতে পারিত না—সে চিন্তা তৃপ্তির।

সে পিশাচী তুল্য বিমাতা কর্ত্তৃক কতই না লাঞ্ছিত হইতেছে, তাহার অত্যাচার জ্বালা যন্ত্রণা সে ত নিজের চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছে—তাহার অজানিত কিছুই নাই। সে থাকিলে দুই ভাই বোন উভয়ে উভয়ের নিকট হৃদয়ের ব্যাথা নিবেদন করিয়া অনেকটা শান্তি পাইত। আজ সে কাহার নিকট তাহার প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবে? কে তাহাকে একটা সমবেদনার কথা জানাইবে? পল্লীর আবহাওয়া তাহার জানিতে কিছুই বাকি নাই। অত্যাচারী ধনীর পদলেহন করিয়া তথাকার অধিবাসীরা আপনাদিগকে সার্থক জ্ঞান করে, তাহারা নিজেদের যে একটা অস্তিত্ব আছে—সেটা একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে একটা কথা বলিবার সাহস পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। এ অবস্থায় তৃপ্তি কাহার নিকট এতটুকু সাহায্য আশা করিতে পারে? বরং হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া যদি

কাহারও নিকট এতটুকু কিছু বলে তবে মাতঙ্গিনীর তৃপ্তি সাধনের জন্যই এতটুকু কথাকেও শতেকটুকু করিয়া তাহার কাণে তুলিয়া দিতে কুণ্ঠাও বোধ করিবে না! হা ভগবান! এই সরলা বালিকা তোমার চরণে কি এমন অপরাধ করিয়াছে যে এতটুকু বয়সে মাতৃহীনা হইয়া তাহাকে এত কষ্টভোগ করিতে হইতেছে! এই সমস্ত চিন্তায় তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিত।

চিন্তার একটানা স্রোত কখন প্রবাহিত হয় না। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া সে হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে। প্রতীবের চিন্তার ধারাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিত না, তৃপ্তির অবস্থার কথা চিন্তা করিতে করিতে অজানিত ভাবে আবার তাহারই চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিত। অন্যের দয়াদত্ত অর্থে তাহার দিনগুলি একরূপ কাটিয়া যাইতেছে—কিন্তু এইরূপ করিয়াই বা কতদিন চলিবে? এরূপভাবে দিন ত শৃগাল কুকুরেরও কাটে, কিন্তু তাহার দিন ত এরূপভাবে কাটিলে চলিবে না। তাহাকে আবার দেশে যাইতে হইবে, পিতার পুত্র হইয়া আবার তাহার বংশের, পিতৃপিতামহের মুখোজ্জ্বল করিতে হইবে। ধ্বংসোন্মুখ পল্লীর দেহে প্রাণ সঞ্চার করিতেই হইবে। আবার তাহাকে মানুষ হইতে হইবে। এরূপ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে তাহার প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা যে আকাশ কুসুমে পরিণত হইবে, তাহার হৃদয় নিহিত সমস্ত সাধ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আবার মনে হইত কি উপায়ে সে তাহার

অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইবে—তাহার সহায় নাই, সম্বল নাই কি উপায়ে সে তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে? একদৃষ্টে নীলাকাশের দিকে চাহিয়া বলিত, ভগবন! তোমার অসীম অনুকম্পায় দীন হীন ভিখারীর বেশে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অযাচিত ভাবে আশ্রয় পাইয়াছি। আমার প্রাণের গোপন ব্যথা তোমারও অজানিত নাই প্রভু! আমার প্রাণের অভিষ্ট কি সিদ্ধ হইবে না দয়াময়! তারপর কে যেন তাহাকে বলিয়া দিত এরূপ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে ত আর জীবনের উন্নতি করিতে পারিবে না, প্রতীব। যদি অভিষ্ট সিদ্ধিই করিতে চাও তবে কর্ম্ম করিয়া যাও, কর্ম্মে ডুবে থাক, কর্ম্মে মজে থাক, কর্ম্মই জীবনের সার কর। প্রতীব এই বাণীকে দেববাণী বলিয়া গ্রহণ করিল, পরদিন হইতে সে একটী কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল।

প্রতীব বিদায় লইবার পর মাতঙ্গিনী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, মনোতোষও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। যে প্রতারক তাহাকে প্রতারিতের নিকট সকল সময়ে সকল কাজে হীনভাবে থাকিতে হয়। ধনৈশ্বর্য্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া অর্থের দ্বারা সকলকে বশীভূত করিয়া প্রকাশ্যে হীনতা স্বীকার না করিলেও মনে মনে তাহাকে বিশেষ শঙ্কিতভাবে থাকিতে হয়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। মনোতোষও এ নিয়মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। এতদিন প্রতীবকে সম্মুখে দেখিলেই তাহার প্রাণ কেমন একটা অশান্তিতে ভরিয়া উঠিত, তাহাকে সম্মুখে দেখিলেই মনে হইত যেন একটা দমকা-গরম হাওয়া তাহার চারিদিকে ঘূর্ণী বায়ুর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহাতে তাহার দমবন্ধ হইবার উপক্রম হইত।

মনোতোষ, হৃদয় ঘোষাল ও স্ত্রী মাতঙ্গিনীর প্ররোচনায় ও ক্ষণিক উত্তেজনার বশে প্রতীবের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিল সেরূপ সর্ব্বনাশ কেহ যে কল্পনায়ও আনিতে পারে তাহা স্বয়ং মনোতোষ নিজেই ভাবিয়া উঠিতে পারিত না। তাই সে যখন প্রতীবকে সম্মুখে দেখিত প্রকাশ্যে যত তিরস্কারই করুক না মনে মনে তাহার নিকট

চোরের অধম হইয়া থাকিত, কারণ সে জানিত, যদি তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ গোপী, সুরেন ও বিনোদ, প্রতীবকে উত্তেজিত করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করায়, তবে তাহাকে কি শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

তাই এ সংবাদ যখন তাহার কর্ণে প্রথম পৌছিয়াছিল, তাহাকে অনুতাপের সহস্র বৃশ্চিক দংশনজনিত জ্বালা অনুভব করিতে হইয়াছিল। রঞ্জনবাবু যখন শান্তির অগ্রদূতরূপে প্রতীবের পক্ষ লইয়া মাত্র তাহার পৈতৃক ভদ্রাসনটুকু চাহিতে আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন মাত্র এইটুকু পাইলেই সে সন্তুষ্টচিত্তে তাহার দিনগুলি কাটাইয়া দিতে পারিবে তখন মনোতোষ যন্ত্রণাদগ্ধ প্রাণে একটা শান্তির, একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল ও বলিল, এ বিষয় আমি ভাবিয়া দেখিব। সেইজন্য বোধ হয় বিরুদ্ধ পক্ষের চক্রান্ত হইতে প্রতীবকে দূরে রাখিবার জন্য তাহার বিদায় কালে ভদ্রাসনের চাবিগুলি দিয়া দিয়াছিলেন।

এখন প্রতীবকে দেশত্যাগী হইতে দেখিয়া মনোতোষ নিঃশঙ্কচিত্তে অপহৃত সম্পত্তির শৃঙ্খলা বিধানে বদ্ধপরিকর হইল। এখন তাহার বালাই দূর হইয়াছে, চিন্তার আর কোনও কারণ নাই। গ্রামের দু দশজন তাহার এই একান্ত গর্হিত কার্য্যের জন্য সমক্ষে কোনও কথা বলিতে না পারিলেও পরোক্ষে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, গ্রামের এই দুরবস্থা, লোকসংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, তাহার স্থানে সেই অনুপাতে জঙ্গলই বাড়িয়া চলিতেছে;

কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে লোকাভাবে পাঁচ ছয় দিন তাহার সৎকার হয় না—এ অবস্থায় গ্রামের একজনকে এইরূপভাবে গ্রাম ছাড়া করা মনোতোষের কি আদৌ ভাল হইয়াছে? আর একজন বলিল, এমন প্রবৃত্তি মানুষেরও হয়? এতদিন ধরে যাকে লালন পালন করিল, যে তোর জন্যে কাঁচা মাথাটা পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাকে কিনা এমনি করে—বলিয়াই বলিয়া উঠিল, কলি আর কাকে বলে ভায়া!

প্রসাদ ঘোষ বিজ্ঞের মত বলিল, আরে ভায়া মার চেয়ে দরদী যে তারে বলে ভান। নিঃস্বার্থ ভালবাসা জগতে কোথাও দেখেছ, সবটাই কেবল স্বার্থের কুটিল আবরণে ঢাকা।

তারক চাটুয্যে বলিল, ও সব কিছু নয় ভায়া ও সব কিছুই নয়, সে যে তাকে ভাল বাসত না তা নয়। আমি জানি সে এমন কথাও বলত, আমার একটা মেয়ে, আর প্রতীবটাকেও গায়ের রক্ত জল করে মানুষ করছি, যদি বেঁচে থাকি তবে ওদের দুজনের বিয়ে দিয়ে সুখী হব।

প্রসাদ ঘোষ তখন বলিয়া উঠিল, দেখ তারক যা তা বলো না। এতটাই যদি তার বুকের টান তবে তাকে শেয়াল কুকুরের মত তাড়াবে কেন?

তারক। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' দ্বিতীয় পক্ষ না পারে এমন কাজই নাই, বিশেষ ও যদি সে তাহার স্বামীকে বেশ ভাল মানুষটী দেখে।

এই সমস্ত আলোচনা যে মনোতোষের কর্ণে না যাইত তাহা নয় কিন্তু সে এই সমস্ত আলোচনাকে ফেরুর চীকার ভিন্ন আর কিছুই মনে করিত না। সম্মুখে কথা বলিবার মত সাহস যাহাদের নাই, দুটা টাকা দিয়া অতি সহজে যাহাদের মুখ বন্দ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহাদের আলোচনার আর মূল্য কি? তাহাদের এই সমস্ত আলোচনার কথা যখন তাহার কর্ণে পৌছিত তখন সে মৃদু হাসিয়া সংবাদ দাতাকে বলিত ও সব কুকুরের ডাক ছাড়া আর কিছু নয় হে। কিন্তু মনে মনে ভাবিত এই দশ পনর হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি যখন সেই মূর্খটার নিকট হইতে বিনা বাধায় বিনা আয়াসে লাভ করিয়াছি তখন পাচ জনের আলোচনায় আমার আর কি ক্ষতি হইবে?

একদিন ভগবান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হাঁ গা বাবা ঠাকুর! ছোট বাবু কোন পত্তর দেছেন আপনাকে?

ভগবান, বাগ্দির ছেলে হইলেও মনোতোষ তাহাকে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদিগের অপেক্ষা অধিক ভয় করিত; কারণ প্রকৃতই সে প্রতীবকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিত। প্রতীবের জন্য সে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত। তাই সে প্রতীবের সংবাদ জানিতে চাহিলে মনোতোষ বলিল, না হে ভগবান! কোনও সংবাদই সে আমায় দেয় নাই।

শুনিয়া ভগবান অতি মাত্রায় চিন্তিত হইয়া পড়িয়া বলিল তাই ত বাবা ঠাকুর। অনেক দিন ছোট বাবু গাঁ ছাড়া হয়ে গেছে। যাবার

সময় পৈ পৈ করে বলে দিলুম পত্তর দিতে—তা এখনও পর্য্যন্ত দিল না, শরীর গতিক কেন আছে কে জানে? তেনার অভাবে গেরাম খানা যে খাঁ খাঁ করতেছে।

মনো :—তাই বটে ভগবান, তুমি তাকে এমনই ভাল বাস বটে তবে কি জান, আমি তার কে ভগবান? যে আমায় সে পত্র দিবে? তোমাকে কিন্তু একটু সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল বৈ কি?

ভগবান :—না দিয়ে কি আর পারবে গা বাবা ঠাকুর? দেবে বৈকি নিশ্চয়ই দেবে। তবে কি না অভিমানটা বড্ড বেশী হয়েছে, বড্ড ঘা খেয়েছে কিনা? তা না হলে সেকি তেমন ছেলে গা—বাবা ঠাকুর?

মনো :—অভিমানের ও কোনও কারণ রাখিনি ভগবান। বরং পাছে অভিমান করে সেই জন্য তাকে তার বাড়ী খানা পর্য্যন্ত দিয়েছি। তুমি অভিমান বলতে পার ভগবান, কিন্তু আমি তাকে বলি নিমক হারাম।

নিমক হারাম?—আশ্চর্য্য হইয়া ভগবান বলিল নিমক হারাম! পূবের সূয্যি পচ্চিমে উঠবার কথা হইতে বিশ্বাস করতে পারি বাবা ঠাকুর, কিন্তু তেনার পক্ষে এ কথাঠা আদৌ বিশ্বাস করতে পারিনি।

"তুমি ত তার ভিতর কার সংবাদ কিছুই রাখ না ভগবান, তাই তাকে তার বাহিরের ব্যবহার দেখে এতটা ভাল মনে করছ। যার খায় তারই সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করে"?

এই কথা শুনিয়া একটা অশরীরি বেদনা ভগবানের দেহ মন ছাইয়া ফেলিল এও কি সম্ভব ? ছোট বাবু নিমক হারাম ? না এও একটা এনার চাল। অন্যের কাছে নিজের সাধু সাজবার চেষ্টা ?—প্রকাশ্যে বলিল, কি বলছেন বাবা ঠাকুর, আপনার কথা যে কিছু বুঝতে পারচিনি।

নিজের ঘরের কলঙ্কের কথা বলে কি হবে ভগবান ? তা না হলে —এই এতটুকু বয়স হতে যাকে বুকের রক্ত জল করে মানুষ করলুম —যার অসুখ বিসুখে দিন রাত্তির জ্ঞান না করে এত বড় করে তুললুম—তাকে কি মিছিমিছিই বাটী হতে তাড়ালাম ভগবান ?

ভগবান এতগুলা কথায় একটা কথাও বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল—ধর্ম্ম আছেন বাবা ঠাকুর, ধর্ম্ম আছেন। তার বিচার খুব সূক্ষ্ম। মানুষের চক্ষে সব গোপন থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর চক্ষে কিছুই গোপন থাকবে না। সময় হলে আপনা হতেই সব বাহির হয়ে যাবে। এমন সময় বাটী হইতে মাধব আসিয়া সংবাদ দিল কর্ত্তা বাবু দিদিমনির বুকের ব্যাথাটা আবার বেড়ে উঠেছে শীঘ্র শীঘ্র আসুন। মনোতোষ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, ভগবানকে আর একবার দেখা করিবার কথা বলিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেল।

প্রতীব চলিয়া যাইবার পর হইতেই তৃপ্তির বুকটা যেন শূন্য হইয়া গেল। মনে হইল যেন তাহার সর্ব্বস্ব খোয়া গিয়াছে। বিমাতার গঞ্জনা, পিতার নিরপেক্ষ ভাব ও প্রতীবের অভাব তাহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিল, সামান্য খুঁটি নাটী ধরিয়া মাতঙ্গিনী যখন তৃপ্তিকে দুশো কথা শুনাইয়া দিত, তখন প্রতীবের অভাব তাহার নিকট এত অধিক বোধ হইত যে জগতে সমস্ত জিনিসের বিনিময়ে ও সে অভাবটা পূর্ণ হইত কি না সন্দেহ। প্রতীব চলিয়া যাইবার পর বিমাতার গঞ্জনা এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, যে, সে কিছুতেই তাহা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া পাড়ায় দু একজন সমবয়সীদের নিকট প্রকাশ করিয়া বুকটাকে কিছু হাল্কা করিবার প্রয়াশ পাইয়াছিল; কিন্তু অদৃষ্ট দোষে হাল্কা হওয়া দূরে থাক বরং অশান্তির আগুণ দ্বিগুন তেজেই জলিয়া উঠিত। তৃপ্তির সমবয়সীরা তাহার দুঃখের কথা তাহাদের মাতা পিসিমা প্রভৃতি অভিভাবিকাদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়া মাতঙ্গিনীর অন্যায় গর্হিত কার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিল। তাহাদের অভিভাবিকাগণ কিন্তু এমন একটা সংবাদ মাতঙ্গিনীর মন পাইবার জন্য তাহার কর্ণে না তুলিয়া থাকিতে পারে নাই।

তাহাদের মুখে তৃপ্তির এই অসম সাহসিক কার্য্যের কথা শুনিয়া মাতঙ্গিনী তাহার উপর আরও অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। তৃপ্তি তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ যাতনার ভার লাঘব করিবার জন্য তাহার সমবয়সীদের নিকট তাহার হৃদয়ের গোপন কথা প্রকাশ করিয়াছিল —কিন্তু এইরূপে ঘটিয়া গেল ঠিক তার বিপরীত, এমনই তাহার অদৃষ্ট! এই ঘটনার পর হইতে সে জানিল এ গ্রামে আপনার বলিতে তাহার কেহ নাই, সই, বকুল ফুল, গঙ্গাজল, সে কেবল বাহিরের, অন্তরের নয়। তাহার পর হইতে কাহারও সহিত বড় একটা মিশিত না, কথা বলিত না, মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিত। রাত্রিতে নির্জ্জনে চক্ষের জলে উপাধান সিক্ত করিত, ভাবিত হায় রে জগতে যার মা নাই তার কেহই নাই। এই সমস্ত চিন্তায় এই উদ্ভিন্ন যৌবনা তৃপ্তির দেহ লাবণ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক তাহার শরীর ক্রমশই কৃশ হইয়া পড়িল। তৃপ্তির মাতা প্রায়ই মনোতোষের নিকট বলিতেন, প্রতীবের সহিত তৃপ্তির বিবাহ দিয়া নিজের গৃহেই রাখিবেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তৃপ্তিও সেই আশাটা মনে মনে পোষন করিয়া আসিতেছিল। প্রতীব তাহাকে ভগ্নি বলিয়া জানিলেও তৃপ্তি প্রতীবকে নিজের হৃদয়ে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিত। পিতা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত অপমানিত হইয়া প্রতীব যখন দেশ ত্যাগ করিল, তখন তাহার মনের আশা মনেই মিলাইয়া গেল—আশা আকাঙ্খা আকাশ কুসুমে পরিণত হইল। ইহার উপর বিমাতার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া

তাহার দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার হৃদ্‌রোগ দেখা দিল। প্রথমটা সে কাহারও নিকট এই রোগের কথা প্রকাশ করে নাই। বিমাতার আদেশ মত নীরবে সংসারের কাজ করিয়া যাইত ও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিত। একদিন দ্বিপ্রহরে যখন সে হৃদরোগে আক্রান্ত হইণা আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল সেই সময় তাহার বেল ফুল মালতি আসিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে বেল ফুল? অমন কচ্ছিস কেন ভাই? তৃপ্তি ধীরে ধীরে যন্ত্রণাকাতরস্বরে উত্তর দিল কৈ কিছুছ ত হয়নি বেলফুল, অমনি শুয়ে আছি। শুনিয়া মালতির চোখ জলে ভরিয়া গেল বলিল আমার কাছেও তুই সব কথা লুকাবি বেল ফুল! তাহার এই কাতরতা দেখিয়া তৃপ্তির প্রাণটাও কাতর হইল, কিন্তু কি করিবে? কেহ দেখিয়া শিখে কেহ শুনিয়া শিখে কিন্তু সে যে ঠেকিয়া শিখিয়াছে, এবং সেই জন্তই যে তার প্রাণের বেলফুলের নিকটও তাহার সব কথা গোপন রাখিতে হইতেছে। সে তেমনি যন্ত্রণাক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল পাখা খানা নিয়ে আমায় একটু বাতাস করনা ভাই।

কেন বল দেখি তোর কি কোনও অসুখ করেছে বেল ফুল? বলিয়া এক খানা হাত পাখা লইয়া তাহার সন্নিকটে উপবেশন করিল। তৃপ্তি কোনও কথা না বলিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। মালতি তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, আমি কি তোর পর বেল ফুল! যে, তোর কি অসুখ করেছে সেটাও আমার নিকট প্রকাশ

করতে লজ্জা বোধ করছিস? বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তাহার এই কাতরতা দেখিয়া তৃপ্তি আর নীরবে থাকিতে পারিল না বলিল, আজ কদিন হতে বুকটার ভিতর বড় যন্ত্রণা হচ্চে। শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে মালতি বলিল সে কি ভাই এতবড় একটা অসুখ তুই চেপে রেখেছিস্—জ্যাঠা মহাশয়কে বলেচিস? তাড়াতাড়ি তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া তৃপ্তি বলিল, তোর পায়ে পড়ি বেল ফুল একটু আস্তে কথা বল, এখনি কেউ শুনতে পাবে।

শুনিয়া মালতি প্রাণে গভীর বেদনা পাইল। সেও তৃপ্তির সমবয়সী শৈশবে এক সঙ্গে খেলিয়াছে, এক সঙ্গে হাসি গল্প করিয়াছে; তৃপ্তির দেওয়া খাবার দুজনে ভাগ করিয়া খাইয়াছে। তৃপ্তি যে এখানে কতটা যন্ত্রণার মধ্যে আছে, তাহা, তৃপ্তির ঐ সামান্য কথা কয়টীতেই বুঝিতে পারিল, কিন্তু বুঝিয়াই বা কি করিবে? সে তাহার বুকে মুখে জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তৃপ্তি কিছু সুস্থ হইলে বলিল, হাঁরে বেলফুল! নীরবে এত বড় একটা রোগ পুষে রেখে সেটা ইচ্ছা মত বাড়িয়ে দিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করা কি ভাল রে।

না করেই বা কি করব ভাই? আমার মুখের দিকে চাইবার কে আছে?

একথায় মালতি আর কোনও কথা বলিল না, কারণ সে যাহা করিতে চায় তাহা যদি তৃপ্তির নিকট প্রকাশ করে তবে সে তাহাতে

বাধা দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করিবে না। মনের কথা মনেই রাখিয়া অন্য দুই চারটী কথা কহিয়া উঠিয়া পড়িল।

যাইবার সময় দেখিল মনোতোষ ও মাতঙ্গিনী কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সে ধীরে ধীরে তাহাদের নিকট গেল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মনোতোষ জিজ্ঞাসা করিল—কি রে মালতি!

জ্যাঠা মহাশয় আপনার নিকট আমার একটা কথা বলবার আছে,—যদি রাগ না করেন ত বলি।

উৎসুক্যের সহিত মনোতোষ জিজ্ঞাসা করিল কি কথারে মালতি?

আগে বলুন, রাগ করবেন না।

না—তুই বল।

আচ্ছা জ্যাঠামহাশয়! একটা লোক যে নীরবে এত বড় একটা রোগে ভুগ্‌ছে, তার জন্য একটা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা বা তার দিকে একটু নজর রাখা কি আপনার কর্ত্তব্য নয়?

কার?—কি অসুখ করেছে রে মালতি?

বেল ফুলের। আপনার মেয়ে, আপনার অন্ততঃ সে খবরটা রাখা উচিত ছিল।

মনোতোষ আর যাই হৌক সে পিতা। কন্যার অসুখের সংবাদ শুনিয়া সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল কি অসুখ রে মালতি?

কি অসুখ তাত জানি না জ্যাঠা মহাশয়, তবে বুকটার ভিতর

অত্যন্ত ধড়ফড় করে অজ্ঞান হয়ে যাবার মত হয়—অনেকদিন হইতেই এই রোগে ভুগছে। এতদিন চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল, জ্যাঠামশায়।

সেও ত আমায় এতদিন জানাতে পারত, মালতি?

নিশ্চয়ই পারত জ্যাঠা মহাশয়। আর সেইটাই তার উচিত ছিল। কিন্তু সে যা হবার হয়ে গেছে জ্যাঠামশায়, আমার বোধ হয় তার একটা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলে ভাল হয়। তা না হলে এ রোগ যদি বেড়ে যায় তবে তাকে বাঁচান বড় শক্ত হবে।

শুনিয়া মনোতোষের প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। যত বড় স্ত্রৈণই সে হোক না কেন, তবু সে পিতা, আজ সে তৃপ্তির প্রতি অন্যের প্ররোচনায় উদাসীন। কিন্তু একদিন ছিল যেদিন তৃপ্তিকে কোলে না পাইলে তার মন প্রাণ সমস্ত হুহু করিত। তৃপ্তির মুখের হাসিটী দেখিবার জন্য সে সোৎসুক নয়নে তার দিকে চেয়ে থাকিত। সেই তৃপ্তির এমন উৎকট পীড়ার সংবাদ তাহাকে একটু কাতর করিয়া তুলিল, বলিল, তাহলে চিকিৎসারই বন্দোবস্ত করি, কি বলিস মালতি?

সকলের আগে সেইটাই দরকার হয়ে পড়েছে জ্যাঠামহাশয়।

দেখি মুকুন্দ ডাক্তারকে না হয় ডাক দেই।

এতক্ষণ মাতঙ্গিনী একটি কথাও বলে নাই, এইবার বলিল, ওসব ডাক্তার ফাক্তার ছেড়ে দিয়ে ওর বিয়ের ব্যবস্থা কর, সব অসুখ

সেরে যাবে। দেখছনা সে ছোঁড়াটা গিয়ে অবধি ও ঐরকম হয়ে পড়ছে—মেয়ে ধেড়ে করে রাখলে যা হয় তাই হচ্ছে।

মনোতোষের অজানিতভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বক্ষপিঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইল। সে বলিল এখন পীড়ার চিকিৎসা অগ্রে দরকার মাতু, তারপর তার বিয়ের কথা।

মাতঙ্গিনী নিজের যুক্তির স্বপক্ষে কত যুক্তির অবতারণা করিল কিন্তু মনোতোষ কোনটাকেই সুযুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিল না। আজ বহুদিন পরে মনোতোষের হৃদয়ে সন্তান স্নেহ প্রবল হইয়া দেখা দিল। একটা অজানিত আশঙ্কায় ভীত হইয়া সে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকাইয়া তৃপ্তির চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে চলিল।

প্রতীব আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া একটী চাকুরির অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিল। তাহার পরিচিত যাহারা, তাহাদিগের সকলকেই বলিয়া রাখিল কিন্তু এমনি তাহার অদৃষ্ট. ছয় মাসের মধ্যে একটি চাকুরিও জুটিল না। দুই একটি পরিচিত বন্ধুবান্ধবদিগের অফিসে দু একটি কার্য্য খালি হইয়াছিল বটে কিন্তু ভাগাড়ে মরা গরু ফেলিলে যেমন পাল পাল শকুন আসিয়া কামড়া কামড়ি মারামারি করে সেইরূপ একটী পঁচিশ কি তিরিশ টাকার কর্ম্মখালিতে পাল পাল বি, এ, এম এ আসিয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং প্রতীবকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয়। নিরাশ হইয়াও সে আশা ছাড়িল না পুনরায় নুতন উদ্যমে সে কর্ম্মের অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিল। প্রাতঃসন্ধ্যা ছেলেদিগের ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া, সাধারণ পাঠাগারে দৈনিক ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে কর্ম্মখালির স্তম্ভ পাঠ করিয়া কোথাও খালি থাকিলে তৎপর দিবস সেই অফিসে যাইয়া তাহার অনুসন্ধান করে কিন্তু কোথাও শুনে already filled up, no vacancy এইরূপ ভাবে তাহার ছয় মাস কাটিল। বিজলিবাবু তাহাকে কার্য্যের জন্য এতটা ব্যগ্র দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন প্রতীব বাবু! একটা চাকুরীর অন্বেষণে আপনি যতটা সময় নষ্ট করিতেছেন, যদি অর্থ উপার্জ্জনই আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে সে

সময়টা গামছা ফিরি করিলে মাসিক ৩০৲।৪০৲ টাকা বেশ ভাল ভাবেই উপায় হইতে পারে। অথচ সেটা স্বাধীন আর চাকুরি—চাকুরি। সেটা পরাধীনতার শৃঙ্খল মাত্র। কিন্তু সে উপদেশ শুনিবে কে? যে জাতি তাহার শিশু সন্তানকে শিখায় তুমি বড় হয়ে চাকুরি করে আমায় টাকা এনে দিবে, যে জাতির চাকুরি করাটাই মজ্জাগত পেষা, যে জাতি তাহার সন্তানাদিগকে শৈশবকাল হইতে শিখাইয়া দেয় চাকুরি তোমার ধর্ম্ম, চাকুরিই তোমার কর্ম্ম, চাকুরিই তোমার ইহকাল, চাকুরিই তোমার পরকাল—সে জাতি চাকুরি ভিন্ন আর কি করিবে? তাই বিজলিবাবুর এই সৎপরামর্শটা প্রতীব গ্রহণ করিতে পারিল না, সে চাকুরিরই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল।

মানুষ যেটার সাধনার তাহার প্রাণ মন সঁপিয়া দেয় শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক সে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়ই। প্রতাব অক্লান্ত পরিশ্রমে আট নয় মাস ছুটাছুটি করিবার পর কোনও এক সদাগরী আফিসে ২৫৲ টাকা মাহিনায় একটী কার্য্য পাইয়া নিজেকে মহা ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিল। বহুদিনের পর দূর আকাশে মেঘমালা দেখিয়া ময়ুরী যেমন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, আজ বহুদিনের আকাঙ্খিত এই চাকুরিটা পাইয়া তাহার মন সেইরূপ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কর্ম্ম প্রাপ্তির প্রথম দিনেই তাহার প্রাণে কত আশার, কত আকাঙ্খার, কত দেশ হিতকর কার্য্যের, অন্ধ, খঞ্জ, গলিত, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ লোকদিগের সাহায্যের ক্ষণিক

বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—কিন্তু হায়! সে বুঝিতেই পারিল না যে ইহা একটা অলীক কল্পনা মাত্র।

এই আশা আকাঙ্খায় প্রণোদিত হইয়া সে বুকের রক্ত জল করিয়া অফিসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে লাগিল। শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই সে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। নিজের কাজ হইয়া গেলে যদি অবসর পায় তবে অন্যের হাতের কাজ কাড়িয়া লয়। উদ্দেশ্য সকলের সহানুভূতি লাভ করা, এবং কোনওরূপে সাহেবদের সুনজরে পড়া। একবার কোনওরূপে তাহাদের নজরে পড়িলে, যেরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম সে করে, তাহাতে শীঘ্রই তাহার বেতন বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু যখন অফিসের বাবুদের নিকট শুনিল যে অফিসের ছোট সাহেবটা অতি ইতর। ভদ্রলোকের সহিত কিরূপে কথা কহিতে হয় তাহা জানে না—যথেচ্ছা গালাগালি করে, তখন সে অনেকটা দমিয়া গেল। চাকুরি করিতে আসিয়াছে বলিয়া যে আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করিতে হইবে এমন কি কথা আছে? জিজ্ঞাসা করিল, এরূপ জঘন্য ব্যবহার পাইয়াও আপনারা এখানে কাজ করেন কিরূপে? উত্তরে তাহারা বলিয়াছিল, কি করব ভাই—পেটের দায়; শুনিয়া প্রতীব বলিয়া ছল, সে ইতরটা আমার সহিত যদি সেরূপ ব্যবহার করিতে আসে তবে তাকে এমন শিক্ষা দিয়ে দেব যে জীবনে আর কখনও সেরূপ ব্যবহার করিবে না। শুনিয়া তাহারা বলিল তা যদি পারেন প্রতীব বাবু, তবে একটা কাজের মত কাজ করা হয়।

বৌভাত

নিশ্চিন্ত থাকুন আপনারা। আমার চাকরি পণ, যদি কোনও দিন সেইরূপ ঘটনা ঘটে, তবে তাকে এমন সায়েস্তা করে দেব, যে জীবনে কখনও আর সেরূপ ব্যবহার করিবার সাহস করিবে না।

দুই একমাস যাইতে না যাইতে প্রতীব তাহাদের কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিল। বাস্তবিকই সাহেব অতি ইতর, নিজের কাজকর্ম্ম কিছুই করে না যা করে তাহার কর্ম্মচারীগণ। সমস্ত দিন সে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া অন্যান্য সাহেবদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া পাঁচটার পর নিজের যায়গায় আসিয়া বসে ও তাহার পর কাজকর্ম্ম দেখে, ইহাতে তাহার বাবুদিগের প্রায় রাত্রি ৭.৮ পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত একগাছি বেত্র হস্তে সে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মত বাবুরা কাজ করিতেছে কিনা তাহা দেখিয়া বেড়ায়।

একদিন প্রতীবকে নিজের কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া অন্যমনস্ক থাকিতে দেখিয়া ছোট সাহেব Mr Dauglas বলিল why, you fool seating idle. অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহেবের নিকট এইরূপ ব্যবহার পাইয়া তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল, মাথার ভিতর ঝিঁ ঝিঁ করিয়া উঠিল—বলিল সাবধানে কথা বলুন সাহেব যত টাকা তোমার নিকট মাহিনা পাই তাহার সুদ সমেত তোমায় উসুল দেই, তোমার গালাগালির কোনও ধার ধারিনা।

এতগুলা বাবুর সম্মুখে এইরূপ ভাবে Dauglas সাহেবের অপমান আজ এই প্রথম। এতদিন ধরিয়া সকলকে যথেচ্ছ

গালাগালি করিয়া আসিয়াছে, সকলে নির্ব্বিবাদে তাহা সহ্য করিয়াছে। আজ একজন নূতন লোকের মুখে এইরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল well I will see you Babu.

সাহেব চলিয়া গেলে অফিসটার মধ্যে একটা ধীর গুঞ্জন শব্দ খেলিয়া গেল। কেহ একটু হাসিয়া বলিল, এতদিনের পর ব্যাটা এই প্রথম অপমানিত হ'ল, কেহ কেহ বিজ্ঞের মত বলিল, কাজটা বড় ভাল হল না, যখন চাকুরীই করতে হবে তখন এতটা দম্ভ দেখান ভাল হয় নি। শুনিয়া প্রতীব বলিল, এ ত কিছুই হয়নি মশায় ফের যদি এইরূপ করে তবে রুলের সদ্ব্যবহার করিব।

এই ঘটনার পর অফিসের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। অফিসের বড়বাবু রামলোচন বাবু প্রকৃতই একজন গুণগ্রাহী লোক। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোককে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসেন। প্রতীবের এই সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—প্রতীব, সাহসিকতার জন্য আমি তোমায় অভিনন্দিত করিতেছি। চাকুরি করতে এসে যে তুমি এখনও ক্লীবত্ব পাওনি, ভগবানকে সেজন্য ধন্যবাদ দিই। তুমি অন্যান্য বাবুদের কথা শুনো না—তাদের ভ্রূকুটী গ্রাহ্য করো না, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বা আত্মমর্য্যাদা বলে কোনও একটা জিনিস নাই, শৃগাল কুকুরের মত তারা বেঁচে আছে। প্রতীব, নমস্কার করিয়া বলিল, আমার উপর আপনার অশেষ অনুগ্রহ।

ডগলাস সাহেব কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে প্রতীবের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তাহাকে শিক্ষা দিবার মানসে বড় সাহেবকে বলিয়া নিজের অধীনে তাহাকে বদলি করাইয়া লইল। প্রতীবও হাসি মুখে তাহার অধীনে কার্য্য করিতে গেল। প্রত্যহই কাজ করিয়া যায়, তবে প্রতীব বুঝিতে পারিল এখানকার অন্নজল আর বেশীদিন নয়। একদিন ঘটনাক্রমে কি একটা কাজের ভুল ধরিয়া ছোট সাহেব তাহার কামরায় প্রতীবকে ডাকাইয়া পাঠাইল। প্রতীব আসিলে একখানা হিসাবের খাতা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ভুলটা কে করিল? প্রতীব নির্ভয়ে উত্তর দিল, আমি করিয়াছি।

You swine বলিয়া ডগলাস আরো কি বলিতে যাইতেছিল প্রতীব কিন্তু তাহাকে আরো কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া রক্ত চক্ষু বাহির করিয়া বলিল shut up Mr Dauglas। ডগলাসেরও ক্রোধের মাত্রা সীমা ছাড়িয়া গেল, কি এত বড় স্পর্দ্ধা নেটিবের? সেও ক্রোধে ধৈর্য্য হারা হইয়া কামিজের আস্তিন গুটাইয়া টেবিলের উপর হইতে রুল গাছটা উটাইতে গেল, প্রতীব কিন্তু তাহাকে লইবার অবসর না দিয়া নিজেই দৃঢ়মুষ্ঠিতে সেই রুল ধারণ করিয়া দুই চারটা তাহার পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া দিয়া অফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বেল ফুল !

কেন ভাই ?

আমায় খানিকটা বিষ দিতে পারিস ভাই ?

কথা হইতে ছিল তৃপ্তি ও তাহার বেলফুল মালতির মধ্যে ।

মালতি তৃপ্তির কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল, বলিল—এই যদি তোর অন্তরের ভাব হয় বেলফুল ! তবে জীবনে কখনও শান্তি পাবিনে ভাই ।

শান্তি পাব বলেই ত বিষের কথা বলছি, বেলফুল, আমায় এই দয়াটুকু কর ভাই ।

মালতি একটা ধমক্ দিয়া বলিল, আহা লো । ও সব কথা মুখ দিয়ে বার হলেও পাপ হয় তা জানিস না পোড়ার মুখী ।

জানি বৈকি ভাই কিন্তু এইরূপ বেঁচে মরে থাকার চেয়ে সে যে অনেকটা ভাল বেলফুল ।

না, লো না আর অত ভুগতে হবে না । জ্যাঠা মহাশয় ত তোর বরের যোগাড় করে ফেলেছেন, বরকে পেলেই সব অসুখ সেরে যাবে বেলফুল, তখন আবার নূতন স্ফূর্ত্তিতে নূতনশ্রী ফুটে উঠবে—আর তোকে বিষ খেতে হবে না, অমৃতের নদীতে স্নান করতে যাচ্ছিস তাতে অবগাহন করে সব জ্বালা ভুলে যাবি ।

ভুল বুঝেছিস্ বেলফুল ভুল বুঝেছিস, অশান্তির আগুন তাতে বাড়বে ছাড়া কমবে না। বাবাকে বলিস ভাই! এরূপ অবস্থায় হয়ত আরও কিছুদিন বাঁচতে পারতাম, কিন্তু বিয়ে দিয়ে যেন আমার মরণের পথটাকে আরো এগিয়ে না আনেন। এ এক জ্বালায় জ্বলছি। কিন্তু জোর করে যদি বিয়ে দেন তবে অসহনীয় জ্বালায় আমায় জ্বলে পুড়ে মরতে হবে বলিতে বলিতে তৃপ্তির চোখের কোণ দিয়া অজস্র ধারে জল গড়াইয়া পড়িল। শুনিয়া মালতি বলিল, কি বলছিস বেলফুল, আমি যে কিছুই বুঝ্তে পারছি না। তোর মনের কথা খুলে বল বেলফুল, এমন ভাবে আর লুকিয়ে রাখিস নে।

সে সব শুনে আর কি করবি বোন! কেবল দুঃখের মাত্রা বাড়ান বৈত নয়।

তবুও তোকে বলতে হবে, রোগের গোড়া ধরতে না পারলে যে হাজার চিকিৎসকের চিকিৎসায় কিছু হয় না রে।

গোড়া ধরতে পারলেও কিছু হবে না বেলফুল, এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

তা যাক তবুও তুই বল্।

বেলফুল? হিন্দু নারীর বিয়ে একবার বই দুবার হয় না।

মালতি চমকাইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ, এর যদি মনের ভাব এইরূপই হয় তবে সত্যই ত এই বিবাহ বন্ধন এর বিষের বন্ধনই হইবে, তাতে বাস্তবিকই অশান্তি ছাড়া শান্তি পাবে না। হা অদৃষ্ট!

কিন্তু অন্তরের ভাব গোপন করিয়া বলিল—কেন লো তুই স্বয়ম্বরা হয়েছিস নাকি।

আমার স্বর্গগতা মা-ই আমাকে বর দেখিয়ে গিয়েছেন সই। বাল্যকাল হতে তাকেই আমার হৃদয়ে স্বামীর আসন দিয়ে পূজা করে এসেছি। এখন সেই আসনে আর একজনকে বসিয়ে ত পূজা করতে পারি না ভাই। বিয়ে আমার অনেক দিনই হয়ে গিয়েছে বাকি আছে মাত্র একটা লৌকিক আচার। বাবাকে বলিস বেলফুল, এ বিবাহ আমি কিছুতেই করব না। ইহাতেও যদি জোর করে বিয়ে দিতে যান তবে হয় বিষ খেয়ে মরব না হয় গলায় দড়ি দেব।

মালতির সাদা প্রফুল্ল মুখে গাঢ় ছায়া পড়িল, ভাবিল, তৃপ্তি এখন আর কচি বালকটী নাই, সে এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতী, নিজের ভাল মন্দ, নিজের বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এখন ভাবিতে শিখিয়াছে। ভগবান এই নিদারুণ বিপদের হাত হইতে আমার বেলফুলকে বাঁচাও, আবাল্য পোড়াকপালি সে, তার কপাল আর পুড়িয়ো না। অনেক জ্বালা যন্ত্রণা সে ভোগ করিয়াছে—একটু সুখের মুখ, একটু শান্তির মুখ তাকে দেখতে দাও, তোমার শান্তিদাতা নামে যেন কলঙ্ক না হয়। প্রকাশ্যে বলিল, একথা এতদিন জ্যাঠামশায়কে বলিস নি কেন বেলফুল? বলেই বা কি হবে ভাই, আর কি আমার মা আছেন। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া হৃদয়ের আবেগে মালতির হাত দুটী ধরিয়া

বলিল, তুই একবার চেষ্টা করে দেখ না মালতি। যদি কোনওমতে এই বিবাহটা বন্ধ করিতে পারিস।

মালতী, তৃপ্তির এই কাতরতা দেখিয়া প্রাণে বড় আঘাত পাইল, বলিল, আচ্ছা বেলফুল আমি একবার চেষ্টা করে দেখব। আরও কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিয়া মালতি চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

মাতঙ্গিনীর সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও কেমন একটা অপত্য স্নেহের টানে মনোতোষ তৃপ্তির হৃদয়ে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক আনাইয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিল, কিন্তু ব্যাধি আরোগ্যের দিকে না যাইয়া তাহার বিপরীত দিকেই যাইতে লাগিল। মনোতোষের এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু মাতঙ্গিনীর ভাল লাগিল না। বৃথা এতগুলা অর্থের অপব্যায় করিবার বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, তোমাদের যেরূপ বিবেচনা, কে জানে বাপু! মেয়েকে ধীঙ্গি করে ঘরে রেখেছ, এত বলছি বিয়ে দাও, ও অসুখ টসুখ সব সেরে যাবে। দেখছ না, ছোড়াটা যাবার পর হতেই ও কেমন এক রকম হয়ে গিয়েছে—। মনোতোষ এতদিন স্ত্রীর নিষেধ না মানিয়া তৃপ্তির চিকিৎসার ব্যাবস্থা করিয়া আসিয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোনওরূপ ফল না পাওয়ায় এইবার তাহার উপদেশ গ্রহণ করিল। তৃপ্তির বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

মনোতোষ অনেক চেষ্টার পর জাঙ্গি পাড়ার এক পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিল। এখানে দিতে

খুতে বেশী কিছু হবে না, অথচ 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' হইয়া সুখে থাকিবে—ইহাই হইল মাতঙ্গিনীর উপদেশ। মনোতোষ প্রথমে তাহার এই পরামর্শে কর্ণপাত করে নাই, সে একটী সৎপত্রেরই চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এতগুলা অর্থ জলের মত অপব্যায় করা মাতঙ্গিনী কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত মনে করিল না। স্বামীকে তাহার মতের বিরুদ্ধে যাইতে দেখিয়া সে দুইদিন সংসারে বিবাদ বিসম্বাদে রাবণের চিতা জ্বালাইয়া দিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল, রন্ধন কার্য্য বন্ধ করিল। অগত্যা মনোতোষ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বৃদ্ধের সহিত তৃপ্তির বিবাহ স্থির করিল, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল।

এত দিন তৃপ্তির প্রাণে আশার একটু ক্ষীন আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিয়াছিল ছোটমা যাহাই বলুক, যতটাই একগুয়ে হোক না কেন বাবা এ কার্য্য করিবেন না, করিতে পারেন না। কিন্তু যখন দেখিল বিমাতার নিকট পরাজিত হইয়া পিতা ঐ বৃদ্ধের সহিতই তাহার বিবাহ স্থির করিলেন তখন তাহার অন্তরে বিদ্রোহের আগুণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিজ্ঞা করিল, মনে মনে যাহাকে একবার পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও হৃদয় দান করিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারিব না—ইহাতে যদি আত্মহত্যা করিতে হয় তাহাও করিব। সে মালতীর দ্বারায় তাহার পিতাকে এ কথা স্পষ্ট জানাইয়া দিল। মালতি এ কথা যখন মনোতোষকে জানাইল, তখন মাতঙ্গিনী সে স্থলে উপস্থিত ছিল,

শুনিয়া বলিল, ঘেন্নায় মরি মা—ঘেন্নায় মরি—বলি শুনলে—মেয়ে যে স্বয়ম্বরা হয়েছে গো, ছিঃ ছিঃ এ কথা জানাতে ও লজ্জা হ'ল না, ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া গেল। মনোতোষ নীরবে সমস্তই শুনিয়া গেল—পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণটা একটু আর্দ্র হইল—কিন্তু হইলে কি হইবে? মাতঙ্গিণীর নিকট এমন ভাবে সে বাঁধা পড়িয়াছে, এমন ভাবে তাহার হাতের ক্রীড়া পুত্তলি হইয়াছে যে তাহার বিরুদ্ধে একটা কথা পর্য্যন্ত বলিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। আজ একবার স্বর্গগতা দীপ্তির আশা আকাঙ্খার কথা মনে পড়িয়া গেল, কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নাই, তাহারা এখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ধীর গম্ভীর স্বরে মালতিকে বলিল, তাহাকে বলিস, মালতি, তাহার ভাল মন্দর দিক দেখিয়া আমরা যা ব্যবস্থা করিব, তাহার উপর কথা কওয়া তাহার উচিত নয়। আর বললেও আমরা তা শুনব না। মালতি তবুও আর একবার চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অগত্যা মালতিকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইল।

মালতির নিকট তৃপ্তি যখন সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিল, তখন তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। কিরূপে এই বিপদ হইতে সে পরিত্রাণ পাইবে? সে দিবা রাত্র ভাবিয়া কুল কিনারা পাইল না—তাহার বিরুদ্ধে পিতামাতা দুই প্রবল শক্তি। তাহাদের বিরুদ্ধে সে কি করিতে পারে? হা ভগবন! কি দুরদৃষ্ট দিয়েই আমায় এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলে; হিন্দুর কন্যা আমি, দ্বিচারিণী

কিরূপে হইব ? মা, মা বলে দাও মা, এখন আমার উপায় কি ? অনেক ভাবিয়া সে কুল কিনারা পাইল না। এই ঘটনার পর হইতে তাহার অসুখটা আরও বাড়িয়া গেল। মনে করিল বিবাহের পূর্ব্বেই যদ আমার এই রোগে মৃত্যু হয়! ভগবন! ভগবন! তুমি নাকি শান্তিদাতা, তুমি নাকি দীন দুঃখীর কাতর প্রার্থনা কান দিয়া শুনিয়া থাক, তাই যদি হয় প্রভো, তবে আর কেন ? এইবার, এইবার আমার নাম পৃথিবী হতে লোপ করে দাও ।

এই সংবাদ কিরূপে জানিনা মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রামের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। চারিদিকে একটা জল্পনা কল্পনা বেশ ভাল ভাবেই চলিতে লাগিল। পুরুষ মহলেই কি, আর নারী মহলেই কি, ইহা একটা নূতন বিষয় একটা নূতন ব্যাপার। ইহার সমালোচনা না হইলে কিরূপে দিন কাটিতে পারে? ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চণ্ডিমণ্ডপে পতিতপাবন, অবনী, আদিত্যনাথ প্রভৃতি নিষ্কর্ম্মাগণ সমবেত হইয়া আলোচনা সুরু করিয়া দিল। আদিত্যনাথ ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কলির এখনও বাকী কত? সমাজের যেরূপ দিন দিন পরিবর্ত্তন হচ্ছে তাতে ত মনে হয় কলির এই শেষ।

ভট্ট্যা।—কেন হে বাবাজি! এমন কি পরিবর্ত্তন দেখলে?

পতিত।—পরিবর্ত্তন নয়? বলেন কি ভট্টাচার্য্য মশায়! আমাদের মনোতোষ বাবুর কন্যা যে স্বয়ম্বরা হয়েছেন।

ভট্টা।—বল কি হে পতিত! এটা একটা নূতন সংবাদ বটে, ব্যাপারটা কি খুলে বলত বাবাজী, আদিত্যনাথ পতিতকে আর কোনও কথা বলিতে না দিয়া নিজেই বলিতে লাগিল, জানেন ত ভট্টাচার্য্য মশায়; মনোতোষ বাবু কত চেষ্টায় জাঙ্গিপাড়ায় কন্যার

বিয়ের স্থির করলেন। পাকা দেখা হয়ে গেল—বিয়ের দিন পর্য্যন্ত স্থির—

ভট্টা।—হ্যাঁ তাত হয়েছেই, তারপর সেখানে কি বিয়ে হবে না নাকি ?

আদিত্য।—শুনুন না ভট্টাচার্য্য মশায় পরের মজাটা। টাকা খরচের ভয়ে মেয়েকে ত মনোতোষ বাবু ষোল বছরের করে রেখেছেন। ঐ ৫০ বছরের বুড়োটার সঙ্গে বিয়ে হবে শুনে মেয়ের কান্নাকাটি—বলে কি না, ও বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে কিম্বা বিষ খেয়ে মরব।

দিন দিন কি হয়ে দাড়াল মশায়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, এতে তোমরা কি দোষ দেখ বাবাজী। মনোতোষ বাবুর কন্যা যা বলেছে তা এমন অন্যায়ই বা কি ? তোমরা তার দোষ দেখছ কিন্তু আমি ত তার দোষ কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। সে এখন বয়স্থা, তার ভাল মন্দ সে এখন নিজেই ভাবতে শিখেছে। বাস্তবিক বাবাজি, পঞ্চাশ বছরের একজন বৃদ্ধের সহিত যদি তার বিবাহ হয়, তবে তাদের মিলনে কি সুখ শান্তি আসবে ? না আসতে পারে ?

পতিত।—বলেন কি ভট্টাচার্য্য মশায় ? হাজার বুড়ো হলেও মেয়ে কি তার বাপ মায়ের নির্ব্বাচনের উপর কথা কহিতে পারে।

ভট্টা।—কেন পারে না পতিত ? তোমাদের পক্ষে যেটা সম্ভব, তারা স্ত্রীলোক বলে তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না কেন ? আর

সেইটাই যদি তোমরা দেখতে বা সহ্য করতে না চাও, তবে মেয়েদিগকে এতটা বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা না রাখাই কর্ত্তব্য। তাদের জ্ঞান বিকাশ হবার পূর্ব্বেই সে ব্যাবস্থা করা উচিত। তাহলে ত তারা একটা কথা পর্য্যন্ত বলতে পারে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট এইরূপ ভাবে উত্তর শুনিয়া—যা বলেছেন ভট্টাচার্য্য মশায়,—বলিতে বলিতে তাহারা সে স্থল হইতে বাহির হইয়া গেল।

এদিকে তাল পুকুরের ঘাটে সুমিত্রা, প্রতিভা, আত্রেয়ী প্রভৃতি রমণীগণ গা ধুইতে আসিয়া এই ব্যাপারটার প্রতি কটাক্ষ করিয়া নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সুমিত্রা বলিয়া উঠিল, হ্যাঁগা ঠাকুরঝি, দিন দিন এসব কি হয়ে উঠল গা—একি অনাছিষ্টি কাণ্ড মা—

আত্রেয়ী।—বড় ঘরের বড় কথা গো দিদি, বড় ঘরের বড় কথা। তোমার আমার ঘরে যদি এই রকম একটা ঘটত, তবে এরই মধ্যে কত কি হয়ে যেত। সমাজ বস্‌ত সালিসী বিচার হত। এ বড় ঘরের কাণ্ড, লুকিয়ে চুরিয়ে কত কাণ্ডই হয়ে যাচ্ছে। সামনে কেউ একটা কথা বলতে পারে?

তাহাদের এইরূপ আলোচনা হইতেছে, এমন সময় তৃপ্তি সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া তৃপ্তির উপর কটাক্ষপাত করিল। প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল—কি লো তৃপ্তি! তোর বাবা ত বিয়ের দিন ঠিক

করে ফেললে। অমুক তারিখে বিয়ে হবে। তুই নাকি ঐ বুড়োর সঙ্গে বে' দিলে গলায় দড়ি দিয়ে মরবি বলেছিস।

তৃপ্তি তাহাদের এই আলোচনায় মরমে মরিয়া গেল। তাহাদের আলোচনার হাত এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি কোনওরূপে কাপড় খানাকে কাচিরা উঠিয়া পড়িল। তাহাদের এতগুলা কথার একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিল না বা দিবার আবশ্যকতা ও বুঝিল না। তৃপ্তি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

প্রতিভা।—কালা মুখি, কালা মুখ লোকের কাছে দেখাতেও লজ্জা করে না—স্যাধে কি আর মাতু দিদি অত মার ধর করে।

সূর্য্য ডুবিয়া যায় দেখিয়া আত্রেয়ী বলিয়া উঠিল, ওমা বেলা যে পড়ে এল, ঘর সংসারের কাজ কর্ম্ম আছে, উঠি দিদি আজ।

সুমিত্রা।—কেন ঘরে ত বউ রয়েছে ঠাকুর ঝি।

আত্রেয়ী।—আর বৌ; গতর আছে কি দিদি, খাবার কুমির, কাজের নামে তার গায়ে জ্বর আসে। এমনি আমি বরাত করে-ছিলাম বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, তাহার দেখা দেখি অন্যান্য রমণীগণ উঠিয়া গেল।

ডগলাস সাহেবকে প্রহার করিয়া প্রতীব অফিস হইতে বাহির হইয়া যেদিকে ইচ্ছা চলিতে লাগিল। যাইবার নির্দ্দিষ্ট কোনও স্থান নাই। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, বাতাসে গায়ে আগুনের ফুল্কি ছড়াইয়া দিতেছে, এরূপ অসহ্য দারুণ গ্রীষ্ম পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। অনেক বৃদ্ধ লোক বলেন, তাঁহাদের এতটা বয়সের মধ্যে, এরূপ গরম কখনও হইয়াছে বলিয়া তাহাদের মনে হয় না। কলিকাতার মত মহান নগরীর জনবহুল পথ একরূপ লোকশূন্য। লোক নাই বলিলেই চলে। এ হেন প্রহরের রৌদ্র মাথায় লইয়া আগুনের হাওয়ার মধ্য দিয়া প্রতীব অসংখ্য চিন্তায় বিভোর হইয়া অগ্রসর হইতেছিল, ভাবিতে লাগিল, এই জাতির অধঃপতনের কথা, ওঃ কি ভীষণ ক্লীবত্ব এই জাতি প্রাপ্ত হয়েছে! নিজেদের আত্মমর্য্যাদা, নিজেদের মান সম্ভ্রম, নিজেদের গৌরব, নিজেদের বৈশিষ্ট্য কেমন করিয়া এত শীঘ্র নষ্ট করিয়া ফেলিল? নিজেদের জীবন চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া নিজকে ভাগ্যবান মনে করে? ভগবন! এই যদি জাতির বৈশিষ্ট্য হয়, তবে আর কেন? এ জাতির নাম এখনও পৃথিবী হইতে লোপ পায় না কেন? আর্য্য জাতির এ অধঃপতন দেখা অপেক্ষা প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে,

ভূকম্পে জলোচ্ছ্বাসে এ জাতির নাম চিরদিনের জন্য লোপ করে দাও।

তাহার চিন্তা-স্রোত আবার অন্যদিকে ফিরিল—এবার সে কি করিবে। তাহার চাকুরীর উন্নতির আশা, অন্ধ খঞ্জ গলিত কুষ্ঠব্যাধি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যের আশা ডুবিয়া গেল। কিন্তু এখন সে কি করিবে, তাহার মূলধন নাই যে ব্যবসা করিবে, জমি নাই যে আবাদ করিয়া আবার কিছুদিন পরে মানুষ হইয়া দাঁড়াইবে। তবে, তাহার মনে পড়িল বিজলিবাবুর পরামর্শ, এইবার হইতে সে পথে পথে গামছা ফিরি করিয়া বেড়াইবে তবু আর দাসত্ব নয়। যে সুখ দাসত্বে তাত সে নিজেই দেখিয়া আসিল, এবার স্বাধীনভাবে নিজেকে চালিত করিবে।

এই সমস্ত চিন্তায় বিভোর হইয়া সে পথ চলিতে লাগিল। যেদিকে চক্ষু যাইতেছে সেই দিকেই চলিয়াছে—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ মাথায় লইয়া সে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে সে সেণ্ট্রাল এভিনিউ রোডে আসিয়া পড়িল। এখানেও দেখিল পথ জনশূন্য, আবার অগ্রসর হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সে যাহা দেখিল তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল একখানি মোটর গাড়ি পাঁচ ছয়জন গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত। চালকের সম্মুখে একজন ভীমকায় লোক একখানি ছোরা ধরিয়া আছে, তিন চারিজন গাড়িখানাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং একজন আরোহীর যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। আরোহী

সবেমাত্র প্রৌঢ়ের সীমা পার হইয়া বার্দ্ধক্যে পা দিয়াছে, তাহার শরীরে যে ক্ষমতা নাই তা নয়, কিন্তু ৫।৬ জন ভীমকায় গুণ্ডার সহিত পারিয়া উঠিতেছে না। সহজে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া গাড়ীস্থিত গুণ্ডাটী তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া একখানা ছোরা তুলিল, এখনি হয়ত বৃদ্ধের জীবন বায়ু শূন্যে বিলীন হইবে, তাহার উষ্ণ রক্তে পৃথিবী বক্ষ সিক্ত হইবে। প্রতীব আর স্থির থাকিতে পারিল না, ভীম বেগে সেই অস্ত্রধারী গুণ্ডাকে আক্রমণ করিল। সহসা পশ্চাৎ দিক হইতে এইরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হওয়ায় অন্যান্য গুণ্ডাগণও একটু হতভম্ব হইয়া পড়িল। এই অবসরে প্রতীব একজনকে দুই হাতে শূন্যে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। এই সুযোগে চালক ও ভদ্রলোকটী প্রতীবকে সাহায্য করিতে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। গুণ্ডারা আর সুবিধাজনক নয় বিবেচনা করিয়া কে কোথায় সরিয়া পড়িল। তখন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী প্রতীবের হাত ধরিয়া নম্র বচনে বলিলেন, আজ তোমারই দয়ায় বাবা আমি আমার জীবন ফিরিয়া পাইলাম। যখন এতটাই করলে তখন যদি তোমার কার্য্যের কোনও ক্ষতি না হয় আমায় বাড়ী পর্য্যন্ত রেখে এস বাবা। আজকার দিনটা আমার বড় দুর্দ্দিন। প্রতীব বৃদ্ধের এই সকাতর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, বলিল, অসুবিধা আমার কিছুই হইবে না, চলুন আপনাকে রাখিয়া আসি।

ওঃ, কি কুক্ষণেই আজ বাড়ী হতে বাহির হয়েছিলাম বাবা, ভাগ্যক্রমে তুমি এসে পড়েছিলে—তা না হলে এতক্ষণ কি হয়ে

যেত। ওঃ—ভাবতে শরীরে কাঁটা দেয়। আর এখানে নয়, এস বাবা গাড়ীতে উঠ; বলিয়া, সেই ভদ্রলোক প্রতীবের হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। এবং চালক গৃহাভিমুখে গাড়ী চালাইয়া দিল।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির নাম ভোলানাথ বাবু। ধনে মানে যশে ইনি একজন খ্যাতনামা পুরুষ। সংসারে বাস করিতে গেলে লোকের যাহা কাম্য, যাহা ঈপ্সিত, যাহা বাঞ্ছিত তাহা তাহার পক্ষে যথেষ্টই ছিল, অথচ এ সমস্তের প্রতি তাঁহার আদৌ আকর্ষণ ছিল না। স্ত্রী একমাত্র কন্যা বেলাকে, রাখিয়া বহুদিন পূর্ব্বেই গত হইয়াছেন। আর তিনি বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ না হইয়া এই কন্যাটীকে লইয়াই দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছেন। সংসারে যদি কোনও কিছুর প্রতি আকর্ষণ থাকে তবে তাহার এই কন্যা—বেলা।

ভোলানাথ বাবু ব্রাহ্ম না হইয়াও কতকটা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন। তিনি ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল গ্রহণও করেন না। সমস্ত দেব দেবীর প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি। এহেন ভোলানাথ বাবু শাস্ত্রকারদের নির্দ্দেশ মত কন্যাকে অষ্টম বর্ষে প্রাত্রস্থ করিয়া গৌরীদানের ফল লাভে আগ্রহান্বিত হন নাই। কন্যা চৌদ্দ ছাড়াইয়া পনেরয় পা দিয়াছে, অথচ তাহার বিবাহের জন্য ভোলানাথ বাবুর এতটুকু উদ্বেগ বা আশঙ্কা দেখা যায় নাই। তিনি কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য এবং তাহাকে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিনী করিবার জন্য

শিক্ষক রাখিয়াছেন। বেলাও তাহার সাধ্যমত উভয় বিদ্যার আয়ত্তে যত্নবতী। সুশিক্ষা গুণে নিজেকে পিতারই মত করিয়া তুলিয়াছে। দয়া-মায়ায়, স্নেহে, অতিথি বাৎসল্যে সে আজকালকার মেয়েদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে। পিতাগতপ্রাণা বেলা, কিছুক্ষণ পিতাকে না দেখিলে কাতর হইয়া পড়ে। সংসারে তাহার এই স্নেহময় পিতা ছাড়া আর কেহ নাই, তাহার শক্তি সামর্থ সমস্তই এই পিতা।

আজ পিতাকে বহুক্ষণ না দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, কারণ তিনি কোনও দিনই এতটা সময় বাহিরে থাকেন নাই। যতই তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছিল, ততই উদ্বেগ আশঙ্কায় তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। উঠিয়া একবার বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়ায়, একবার বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখে তাহার পিতা আসিলেন কিনা—এইরূপ ভাবে দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। ভোলানাথ বাবু তখনও না আসাতে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। বাড়ীর ভৃত্য রামলোচনকে জিজ্ঞাসা করিল হারে রামু, বাবার ফিরতে এতটা দেরি হচ্চে কেন বল দেখি? রামু তাহার দিদিমণিকে এতটা কাতর হইতে দেখিয়া প্রবোধ দিবার জন্য বলিল, কোনও কাজের ঝন্‌ঝটে পড়ে গেছেন দিদিমণি, তার জন্য ভাবনা কেন?

ভাবনা যে আপনিই আসে রামু—দিন দিন যেরূপ গুণ্ডার দৌরাত্ম্য বেড়ে উঠেছে তাতে কেহ বাহিরে গেলে, ফিরে না আসা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার উপায় কৈ?

রামু।—তা বটে, তবে বাবুর জন্য ভাবনার কোনও কারণ নেই, তিনি হাওয়া গাড়ীতে গেছেন।

বেলা।—হাঁ, তা গিয়েছেন তবে—”

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে ভোলানাথ বাবু বাহির হইতে ডাকিলেন—বেলা—বেলা—মা।

পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, এত দেরি কেন বাবা! বলিতে বলিতে বেলা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। তাহার সহিত অপরিচিত প্রতীবকে দেখিয়া কতকটা লজ্জিত হইয়া পড়িল। কিন্তু ভোলানাথ বাবু বলিলেন, ইহাকে দেখিয়া তুই লজ্জিত হয়েছিস মা—লজ্জা করবার কোন কারণ নাই মা, এ আমার প্রাণদাতা, স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি।

প্রতীব বাধা দিয়া বলিল, ও কথা বলিবেন না, ও সমস্ত কথা শুনিতে নাই।

বেলার সংশয় আরও বাড়িয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছিল বাবা? তোমার এত দেরী হল কেন?

বিলম্বের কথা কি বলছিস মা, তোর বাবার প্রাণ এতক্ষণে কোন অজানা দেশে চলে যেত। তোর এই বাবাটীকে যে পুনরায় ফিরে পেয়েছিস তা কেবল এই যুবকের দয়ায়। এর কাছে লজ্জা করিসনি মা বরং কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

বেলা।—কি হয়েছিল বাবা?

ভোলানাথ বাবু তখন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। কেমন

করিয়া তিনি গুণ্ডাদের হস্তে পতিত হন, কেমন করিয়া মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রতীব আসিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিল; শুনিতে শুনিতে প্রতীবের বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি দেখিয়া, তাহার সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া তাহার গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল। প্রতীবকে নমস্কার করিয়া বলিল, মহাশয়! হৃদয়ের অন্তঃস্তল হতে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আপনি আমার পিতার জীবনদাতা,—আপনার নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞ।

প্রতীব।—এইরূপ কথা যদি আপনারা বলেন, ক্ষমা করবেন, আমাকে তাহলে এস্থান এখনই পরিত্যাগ করতে হবে। আমি এমন কি কাজ করেছি যে, যার জন্য আমার নিকট আপনারা এতটা নম্রতা স্বীকার করছেন? আমি যে কাজ করেছি, আমি না হয়ে যদি অন্য কেহ থাকিত তবে সেও ঠিক এই কাজ করত।

ভোলা।—না বাবা, এইটাই ভুল বুঝিতেছ। অন্য কেহ হলে তোমার মত জীবন বিপন্ন না করে তার নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য অন্য দিকে ছুটে পালাত। দেশ এখন কাপুরুষে ভরে গিয়েছে, এখন তোমার মত সাহসী যুবকদের আবির্ভাবে, হৃদয়ে আনন্দ এনে দেয়, কৃতজ্ঞতা এনে দেয়। এটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করলে প্রাণের মধ্যে একটুও সন্তোষ আসে না। কন্যাকে বলিলেন, মা বেলা এই দুপুরে পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্চে—একটু চায়ের বন্দোবস্ত কর।

প্রতীবেরও বড় কম পিপাসা পায় নি।

প্রতীব ঈষধাস্যে বলিল—আজ্ঞে আমি চা পান করি না।

ভোলানাথ বাবু।—সে কি বাবা? তুমি চা পান কর না? আজকাল যে ঘরে ঘরে এটা চলন হয়েছে।

প্রতীব।—তা হোক্, ওটা আমার ধাতে কেমন সয় না।

ভোলানাথ বাবু।—কারণ।

প্রতীব।—তা জানি না, তবে বাঙ্গালীর ছেলে আমরা, বাংলার জল বায়ুতে যা সহ্য হয় এমন সব জিনিষই ব্যবহার করা উচিত। এটা ত আমাদের দেশের নয়, এটা ব্যবহার করা কেবল অজীর্ণ অগ্নিমন্দাকে আদরে ডেকে আনা। তাহার কথা শুনিয়া বেলা বলিল—আমি ওঁর জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করেছি, বলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিল।

ভোলানাথ বাবু বলিতে লাগিলেন, যা বলেছ তা সম্পূর্ণই সত্য; আমরা এখন এতটা সৌখীন হয়ে পড়েছি, এতটা অনুকরণ প্রিয় হয়ে উঠেছি, যে সবটাতেই আমরা সাহেবদের অনুকরণ করতে যাই, তা সেটা আমাদের যত বড় অনিষ্টজনকই হোক না কেন।

প্রতাব।—আর এই সব বৃথা অনুকরণের জন্য নিজেদের শক্তি স্বাস্থ্য পুরুষত্ব সব হারিয়ে ক্লীবের মত আমাদিগকে দিনের পর দিন গুলাকে কাটিয়ে দিতে হচ্চে, কিন্তু এই চাএর বদলে যখন ভিজা ছোলা, আদা ও মিছরির সরবত প্রভৃতি দেশীয় জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, তখন কতটা শক্তিমান এই জাতিই ছিল, কতটা সুখ, কতটা শান্তি, কি অটুট স্বাস্থ্যই না তাদের ছিল?

ভোলা।—তা যা বলেছ বাবা, তখনকার লোক যেমন স্বাস্থ্যবান

ছিল তেমনি ভোগী ছিল, এখনকার মত রোগজীর্ণ কঙ্কালসার ছিল না। তাহাদের কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় বেলা ডাবের জল লইয়া আসিল। প্রতীব এই ডাবের জল পান করিয়া তৃপ্তি সহকারে বলিল—আঃ, প্রাণটা যেন অনেকটা শীতল হল। ভোলানাথ বাবু চা পান করিতে করিতে প্রতীবের পরিচয়, বর্ত্তমান বাসস্থান প্রভৃতি একটী একটী করিয়া জানিয়া লইলেন। প্রতীব, ভোলানাথ বাবুও বেলাকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। যাইবার সময় ভোলানাথ বাবু, প্রতীবকে মধ্যে মধ্যে আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। প্রতীব ও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া প্রস্থান করিল।

বিজলি বাবু বাড়ী আছেন ?

কে—প্রতীব নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এমন অসময়ে ! আজ কি অফিসে যাও নাই—

গিয়াছিলাম, কিন্তু চাকুরি আর আমার পোষাইবে না। আজ ইস্তফা দিয়া আসিয়াছি।

সে কি ? যার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিলে, সেটা হাতে পেয়েও এমন ভাবে ছেড়ে দিয়ে এলে ? হঠাৎ সেটার প্রতি এত বিতৃষ্ণা কেন ?

সবাই যেটার জন্য লালাইত হয়, মনে করতাম সেটা কত উচ্চ, কত মহান কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে যখন দেখলাম সেটা মাকাল ফল ছাড়া আর কিছুই নয় ; তখন আর তাহাতে প্রবৃত্তি রহিল না। এক লহমায় দাস শৃঙ্খল খুলে ফেলে দিয়ে আবার ছুটে ফিরে এলাম বিজলি বাবু। এখন বার বার আপনার কথাটাই মনে পড়ছে।—

দাসত্ব—দাসত্ব অপেক্ষা গামছা ফিরি করায় স্বাধীনতা আছে। হঠাৎ সেটার উপর এত বিতৃষ্ণা হবার কারণ কি, যেটা সকলের কাম্য সকলের ঈপ্সিত, সেটার প্রতি হঠাৎ এমন বিরাগ হল কেন ?

সকলের কাম্য হলেও এখন আর আমার সেটা কাম্য নয়। গোলামখানায় আর বেশী দিন কাজ করিলে একটু একটু করে দেহের প্রত্যেক অনু পরমানু গোলামির বিষ প্রবেশ করে নিজের আত্ম-সম্মান, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট করে দেবে।

তাত দেয়ই, তা জেনে শুনেও ত হাজার হাজার লোক ইহাদ্বারা তাদের সংসার নির্ব্বাহ কর্‌ছে।

আমি ও হয়ত তাই করতাম বিজলিবাবু, কিন্তু ডগলস্ সাহেব আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। ডগ্‌লাস্‌কে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি, কেহ কেহ এখনও আত্ম সম্মানকে সকলের উপরে স্থান দেয়।

বিজলি বাবু এতক্ষণ তাহার কথা শুনিতেছিলেন, কিন্তু এই কথায় তাহার কেমন ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে প্রতীব?

এখনও বুঝতে পারলেন না বিজলি বাবু?

না তুমি সব খুলে বল।

প্রহারেন ধনঞ্জয়।

সে কি?

আশ্চর্য্য হচ্ছেন, বিজলী বাবু?

হবার কথাই যে, কি হয়েছে তুমি সব খুলে বল।

প্রতীব তখন একটী একটী করিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। ডগলাসের অত্যাচার তাহাকে প্রহারের কথা পর্য্যন্ত বলিয়া গেল, শুনিয়া বিজলী বাবুর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল, প্রতীবকে বলিলেন—

আজ যে কাজ তুমি করেছ, তার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি—আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হতে। এই ত চাই—আত্ম-মর্য্যাদা জিনিষটাকে একরূপ নির্ব্বিকার চিত্তে নষ্ট করব কেন ?

প্রতীব।—আপনি ত বলছেন নষ্ট করব কেন ? কিন্তু দেশের যে শতকরা নিরানব্বই জন সেইটা করেই বসে আছে।

বিজলি বাবু এসব কথা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন। হ্যাঁ হে প্রতীব ! তোমার সাহেব এই অপমানটা নীরবে সহ্য করবে না একটা পুলিসের হাঙ্গামা বাধিয়ে দেবে ?

তাই যদি করে বিজলি বাবু তাতেই বা ভয় কি ? এখনও বিবাহ করিনি, জেলে যেতে হয় যাব। বিজলি বাবু কিন্তু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, তুমি এই সময় দিন কয়েক তোমার গ্রামে যাও।

গ্রামের কথা শুনিয়া প্রতীবের মনের মাধ্য একটা ভাবের উদয় হইল—সেই গ্রাম, যেখানের আকাশে বাতাসে পিতৃ পিতামহের পদরজ মিশ্রিত আছে সেই গ্রাম ! কিন্তু সে যে জীবনের মত তাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

তৎপর দিবস সে গ্রামখানির উদ্দেশে ধাবিত হইল।

পাঁচ বৎসর পরে, প্রতীব আজ তাহার প্রিয় গ্রামখানির মধ্যে আসিয়া যেমন এক স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিল, তেমনি আবার তাহার শ্রীহীন অবস্থা দেখিয়া চমকিত ও অতিশয় দুঃখিত হইল। সে যখন এই গ্রামখানিকে ছাড়িয়া যায় তখন তাহার যেরূপ শ্রী সৌন্দর্য্য ছিল, যেরূপ লোকের বসতি ছিল, এখন তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তিন ভাগ লোক মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে গ্রামখানি যেরূপ দ্রুত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে আর দশ বৎসর যদি এইরূপ ভাবে চলে তবে ইহার অস্তিত্ব বলিতে কিছুই থাকিবে না। কেবল প্রেতের লীলা ভূমি হইবে।

ইহারই মধ্যে ত গ্রামের পথ ঘাটগুলি মজিয়া গিয়াছে, পথের দুই পার্শ্ব হইতে কাঁটার গাছ মাথা তুলিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইয়াছে যে পথিককে অতি কষ্টে, অতি সাবধানে পথ চলিতে হয়। পরিত্যক্ত বাড়ীগুলি শৃগাল কুকুরের বাসভূমি হইয়াছে। দুই চারিজন যাহারা বাঁচিয়া আছে সকলেই জীবন মৃত।

গ্রামের অবস্থা দেখিয়া প্রতীবের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। এই কয় বৎসরে কি অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পাচ বৎসর তাহার

ক্রীড়াশিক্ষার গুরু ভগবান কাকার কোনও সন্ধান পায় নাই ও নিজেও লয় নাই। কিন্তু আজ গ্রামের এই অবস্থা দেখিয়া তাহার ভয় হইল—ভগবান কাকা জীবিত কিনা। মনোতোষ ও প্রীতির জন্য ও তাহার হৃদয়টা চঞ্চল হইল, সে উদ্বেলিত হৃদয়ে চঞ্চল পদে ভগবান কাকার কুঁড়ে ঘরখানির সম্মুখে আসিয়া ডাকিল।—ভগবান কাকা!

ভগবান তখন আপন ভোলা হইয়া গাহিতেছিল।

"সংসার রাঙ্গা ফলে ভুলিব না আমি আর।
খাইয়ে দেখেছি মাগো নাহি তার কোনও সুতার"

প্রতীবের আকুল আহ্বান বোধ হয় তাহার কানে পৌছায় নাই, তাই প্রতীবের নিকট সে আহ্বানের কোনও উত্তর আসিল না। প্রতীব এবার আরও একটু জোরে ডাকিল—ভগবান কাকা।

এ ডাক ভগবানের কানে পৌছিল। ভগবানের মনে হইল, এমন সন্ধ্যার অন্ধকারে কে আমাকে ডাকিতেছে, আবার ডাক আসিল, ভগবান কাকা। এ নিশ্চয়ই ছোট বাবুর ডাক, সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, দেখিল তাহার অনুমান মিথ্যা নয়, সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতীব, কিন্তু তাহার আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বহু দিনের পর হঠাৎ প্রতীবকে তাহার কুটির প্রাঙ্গনে দেখিয়া ভগবান আনন্দের আতিশয্যে দৌড়াইয়াই তাহার নিকট গেল। প্রণাম করিয়া বলিল, এত দিন পরে কি এ গরীবদের মনে পড়ল ছোট বাবু?

প্রতীব ধরা গলায় বলিল, কি করব কাকা, জানত প্রাণের মধ্যে কি অসহ্য বেদনা লয়ে গ্রামখানা ছেড়ে গিয়েছিলেম—বাধা দিয়া ভগবান বলিল, ও সব কথা পরে হবে ছোট বাবু, এখন একটু ঠাণ্ডা হও—বলিয়া একখানা চাটাই পাতিয়া দিল।

প্রতীব তাহার ভক্তিদত্ত চাটায়ের উপর উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—নিতে, গৌরে সব কোথায় কাকা? বাগ্দি খুড়ীরও ত কোন সাড়া পাচ্ছিনা। নিতাই ও গৌর ভগবানের পুত্র এবং প্রতীবের বাগ্দি খুড়িই ভগবানের স্ত্রী। তাহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন মাত্র ভগবান বলিয়া উঠিল, তারা আর কেউ দেখা দেবে না ছোটবাবু, এই বুড়ো বয়সের বুকের হাড় ক'খানাকে চুরমার কয়ে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। এত দিন ধরে খাওয়ালাম, পরালাম, মানুষ করলাম, তা এমনি নিমকহারাম সব, এই বুড়োটাকে একলা রেখে সবাই মিলে চলে গেল। ভগবান আর বলিতে পারিল না; তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, নয়ন অশ্রু সিক্ত হইল।

ভগবানের এই বুকফাটা কথা শুনিয়া প্রতীব মর্ম্মাহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছিল কাকা?

ভগবান।—নিতেটা ম্যালেরিতে ভুগে ভুগে মারা গেল। ওবছর গেরামখানায় মাএর অনুগ্রহ এসে দেখা দিলে, কোনও ঘরই বাদ গেল না, তাইতেই বউটা ও গৌরে চলে গেল। এক মাসের মধ্যে গেরামখানাকে শ্মশান করে দিয়ে গেল।

প্রতীব একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, এই পাঁচ

বৎসরের মধ্যে গ্রামখানার কি অবস্থাটাই হয়ে গিয়েছে কাকা, দেখলে বুক ফেটে যায়, চক্ষে জল আসে।

ভগবান।—আর বাবু সেই বছর হতে ম্যালেরিয়ার যে রকম বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে তাহাতে যে এই ক'ঘর এখনও বেঁচে আছে এই যথেষ্ট।

প্রতীব।—তাই ত কাকা! আচ্ছা তোমরা সবাই মিলে এই জঙ্গলগুলাও পরিষ্কার করতে পার না। তা যদি পারতে, জল নিকাশের পথটাও যদি পরিষ্কার রাখতে পারতে, তাহলে ত আর ম্যালেরিয়ার এত বাড়াবাড়ি হত না।

ভগবান।—গাঁয়ে আর কে আছে বাবা, যে তাদের ঝোঁকে এই সব কাজ হবে। এই বাগ্দি পাড়াটায় তুই কত লোক দেখে গিয়েছিলি বল্ দেখি? আর এখন আছে কেবল রামা, শ্যামা আর এই হতভাগা। যে দু এক ঘর আছে তাও আবার দুদিন ভাল থাকে ত দশদিন বিছানা লয়। এরা আর গ্রামের কি দেখবে বলত?

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রামের এতটা অধঃপতনে বিশেষতঃ ভগবানের পারিবারিক দুর্ঘটনায় প্রতীব ব্যথিত হইয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল, কি করবে কাকা! তোমরা যে ক'ঘর এখনও বেঁচে আছ, সে ক'ঘর যাতে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে পার সেইটারই চেষ্টা কর।

ভগবান ইহার কোনও উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

প্রতীব।—জ্যাঠা মহাশয়ের খবর কি? তৃপ্তি ভাল আছে ত কাকা?

ভগবান।—হাঁ বাবা, তারা সব একরূপ ভালই আছে। তৃপ্তির বিয়ে যে শুক্রবার।

প্রতীব।—তাই নাকি? তাহলে ত ঠিক সময়েই এসে পড়েছি।

ভগবান।—হাঁ তা এসেছিস্ বৈকি বাবা, তবে আরও যদি কিছুদিন আগে আসতিস্।

কেন কাকা?

ভগবান তখন তৃপ্তির বিবাহের ইতিহাস—একজন পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত তৃপ্তির বিবাহের স্থির, তৃপ্তি তাহাতে কঠোর আপত্তি, গ্রামে এই লইয়া কত কেলেঙ্কারীর কথা প্রভৃতি একে একে সবিস্তারে বলিয়া গেল। প্রতীব যেন তাহার কথাগুলি গিলিয়া খাইতে লাগিল, ভাবিল হায়! সেই আদরের তৃপ্তি আজ জীবনমৃত হইয়া থাকিতে চলিয়াছে, তাহার আর কিছুই ভাল লাগিল না, বলিল, এবার উঠি কাকা, বাটীর চাবিটা দাও।

ভগবান চাবি লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রতীব নিজ গৃহে যাইবার পূর্ব্বে তাহার প্রতিপালক মনোতোষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে ভুলিল না। এতদিন পরে প্রতীবকে দেখিয়া মনোতোষ বাস্তবিকই আনন্দিত হইল, যতই সে পর হোক না, তাহাকে ত প্রতিপালন করিয়াছে। কিন্তু প্রতীব যখন মাতঙ্গিনীর

পদধূলি গ্রহণ করিল তখন মাতঙ্গিনীর মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত অন্ধকার হইয়া গেল। তৃপ্তি আসিয়া যখন প্রতীবের পদধূলি লইল, তখন তাহার আকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রতীব চমকাইয়া উঠিল, ভাবিল এই কি সেই তৃপ্তি? একি হয়ে গিয়েছিসরে তৃপ্তি? তৃপ্তি তাহার কথার উত্তর দিতে পারিল না। আঁচলের খুঁটে মুখটা একবার মুছিয়া লইল, কোনও কথা বলিল না।

সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রতীব যখন মনোতোষের নিকট বিদায় লইল তখন সে তাহাকে তাহার বাটিতেই থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল কিন্তু প্রতীব তাহা শুনিল না। মনোতোষ বলিল, যদি একান্তই যাইবে তবে যে কয়দিন থাকিবে আহারাদি এইখানেই করিও। তাহার এই অনুরোধ প্রতীব কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। মনোতোষ বলিল, আজ যত বড়ই তুমি হও না কেন, প্রতীব, তবুও তোমায় এতটুকু বয়স হতে মানুষ করিয়াছি, প্রতীব আর না বলিতে পারিল না। সেইখানেই আহারাদি করিতে স্বীকৃত হইল।

প্রতীব আহারাদি করিয়া তাহার নিজগৃহে প্রস্থান করিলে পর, মনোতোষ মাধবকে দিয়া প্রতীবের জন্য শয্যাদি পাঠাইয়া দিল, ভাবিল, এতদিন পরে আসিয়াছে, শয্যার অভাবে কষ্টে পড়িবে।

পক্ষাধিককাল অতিবাহিত হইলেও প্রতিশ্রুতি মত প্রতীব সাক্ষাৎ করিতে না আসায় ভোলানাথ বাবু একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নির্জ্জীব বলহীন বাঙ্গালীর মধ্যে এই অসমসাহসিক অনাড়ম্বর, সরল প্রকৃতি পরহিত ব্রত প্রতীবের প্রতি তাঁহার নিজের অজানিত ভাবে কেমন এক অপত্য স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল। ভোলানাথবাবু নিজেই সেটা বুঝিতে পারেন নাই। পক্ষাধিককাল, আজ নয় কাল আসিবে করিয়াও প্রতীব যখন আসিল না, তখন প্রতীবের অমঙ্গল আশঙ্কায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বেলার সহিত প্রত্যহই প্রতীবের সম্বন্ধে আলোচনা হইত। বেলাও পিতার প্রাণদাতা দৃঢ় বলিষ্ট যুবকটিকে ভক্তি ও ভালবাসার চক্ষে দেখিয়াছিল। আজ তাহার পিতাকে প্রতীবের জন্য এতটা কাতর ও উদ্বিগ্ন হইতে দেখিয়া প্রতীবের উপর তাহারও প্রচণ্ড অভিমান হইল। ভোলানাথ বাবু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন তাইত মা, আজ পোনেরো দিন হইয়া গেল প্রতীব কেন আসিল না বল দেখি?

অভিমানের সুরে বেলা উত্তর দিল, তিনি যদি নাই আসেন বাবা! তার জন্য তোমার এত চিন্তা কেন?

কন্যার কথা শুনিয়া ভোলানাথ বাবু বলিলেন—বলিস কি?

বেলা। চিন্তার যে অজস্র কারণ আছে মা, সে যে আমার প্রাণদাতা। আমার ভয় হয় মা, সে কোনওরূপ বিপদে পড়ে গেছে।

তোমার কেবল ঐ এক কথা—বিপদ, আর না হয় অসুখ।

বলিস কি মা, মানুষের কখন কি ঘটে তাকি বলা যায়? এই সেদিন পথে গাড়িতে আসতে আসতে কি বিপদটার মাঝে পড়েছিলুম? এই কথায় বেলার মনটাও আলোড়িত হইয়া উঠিল, মনে করিল, সত্যই ত, বিপদ কখন কাহাকে কি ভাবে বরণ করে তা কে জানে? ভগবন! তাঁহার যেন কোনও বিপদ না ঘটে, প্রকাশ্যে বলিল, বাবা! তুমি নিজেই কেন তাঁর একবার খোঁজ লও না?

ভোলানাথ বাবুর যেন চমক ভাঙ্গিল, বলিলেন, ঠিক বলেছিস্ মা, এমন ব্যাকুলতার মধ্যে দিন কাটান অপেক্ষা কাল প্রত্যুষেই আমি নিজেই সমিতিতে গিয়ে তার খোঁজ লইব।

পরদিন ভোলানাথ বাবু নিজেই তাহার সংবাদ লইবার জন্য সমিতিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এতগুলি বালক ও যুবককে দৈহিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে দেখিয়া বাস্তবিকই আনন্দিত হইলেন। এক মাস পূর্ব্বে তিনি এই খেলাধূলাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু জীবন বিপন্ন হইবার পর হইতেই তাহার জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়া গিয়াছিল; তাই আজ এতগুলিকে একসঙ্গে খেলা করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

এই বৃদ্ধ লোকটীকে নিশ্চল অপলক নেত্রে তাহাদের খেলাধূলা দেখিতে দেখিয়া বিজলিবাবু নিকটে আসিয়া তাহাকে সমিতির ভিতরে যাইতে সবিনয় অনুরোধ করিলেন। ভোলানাথ বাবু তাড়াতাড়ি মোটর হইতে অবতরণ করিলেন। বিজলি বাবুকে বলিলেন, তোমাদের এই খেলাধূলা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি বাবা।

বৃদ্ধের এইরূপ সহানুভূতি-সূচক কথা শুনিয়া বিজলিবাবু সানন্দে বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়—

আমার নাম ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজলি।—আপনার নামই ভোলানাথ বাবু! প্রতীবের মুখে আমি আপনার নাম শুনিয়াছি।

ভোলানাথ বাবু এতক্ষণ ছেলেদের খেলাধূলা দেখিয়া প্রতীবের কথাটা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। বিজলিবাবুর মুখে তাহার নাম শুনিয়া তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা! তিনি কোথায়? প্রথম আলাপের পর তৎপর দিবস পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া আসিলেন, কিন্তু আজ পক্ষাধিক কাল হইতে চলিল আর তাহার দেখা পেলাম না, তার জন্য বড় দুর্ভাবনায় পড়ে গিয়েছি বাবা।

তিনি সেই দিনই দেশে চলে গেছেন। তাহাকে আসবার জন্য পত্র দিয়েছি, খুব সম্ভব দু এক দিনের মধ্যে এসে পড়বেন।

ভোলানাথ বাবু বিস্মিত ভাবে বলিলেন—দেশে গেছেন তাইত!

কিন্তু যাইবার পূর্ব্বেও একবার আমাদের সহিত দেখা করে যাওয়া উচিৎ ছিল।

ক্ষমা করবেন মশাই! সে অবকাশ আমরা তাহাকে দিতে পারি নাই। এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, যে, আমরা তাকে সেই দিনেই তাহার দেশে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হয়েছি।

ভোলানাথ বাবুর সংশয় আরও বাড়িয়া গেল। তিনি শঙ্কাকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কি ঘটনা ঘটেছিল বাবা—আমি শুনতে পাই না?

আপনার নিকট বলিতে বাধা নাই, কারণ বুঝিতে পারিতেছি আপনি তার একজন হিতৈষী।

ঠিক বলেছ বাবা, আমি কেবল তার হিতৈষীই নই, সে আমার জীবনদাতা ও পুত্র স্থানীয়।

বিজলিবাবু তখন প্রতীবের চাকরী জীবনের ঘটনা—ডগলাস সাহেবকে প্রহার পর্য্যন্ত একটী একটী করিয়া সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন।

অন্য সময় হইলে ভোলানাথ বাবু হয়ত এই কার্য্যটাকে গুণ্ডার কার্য্য বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু আজ তাহার মনের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন প্রতীবের উপর প্রবল অনুরক্তি বশতঃ প্রতীবের সমস্ত কার্য্য প্রীতির চক্ষে দেখিলেন।

বিজলিবাবু বলিতে লাগিলেন, সেদিন তার অফিসের বড়বাবু আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, সাহেব এখন প্রতীবের উপর

বড়ই সন্তুষ্ট। সাহেব এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহার স্কন্ধে একটা সয়তান চাপিয়াছিল, প্রতীব সেটাকে দূর করিয়া দিয়াছে। আমরা প্রতীবকে সে বিষয় জানাইয়াছি, সেও খুব শীগ্রই আসিবে।

তারপর অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর ভোলানাথ বাবু তাহাদিগের নিকট বিদায় লইলেন এবং যাইবার সময় বার বার বলিয়া গেলেন—প্রতীব আসিলেই যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়া দেন।

প্রতীব যে কয়দিন গ্রামে রহিল, শ্মশান-সদৃশ পল্লীজননীর বক্ষ হইতে বন জঙ্গলের শিকড় পর্য্যন্ত উপাড়িয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইল। এই কার্য্যে যখন কাহারও সাহায্য পাওয়া গেল না, তখন সে নিজেই কাটারি, কোদাল লইয়া বাঞ্ছিত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল।

ভগবান প্রথমে তাহাকে এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিল, এ পণ্ডশ্রম আর কেন বাবা? এ গ্রামের আর রক্ষা নাই, এ গ্রাম রসাতলে গিয়াছে, তুমি দুই দিনের জন্য আসিয়াছ, এই সব কাজে শরীরটাকে নষ্ট কর না। উত্তরে প্রতীব বলিয়াছিল, তাও কি কখন হয় কাকা! এ যে আমার পল্লীজননী। মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট হয়ে আমি এখানে প্রথম সূর্য্যালোক দেখেছি। ছেলেবেলায় যে এই গ্রামের বুকে ইচ্ছামত বেড়িয়েছি, এই গ্রামখানিতেই যে তোমার আমার পিতামাতার শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়াছে। এ গ্রামের কি এরূপ দুর্দ্দশা দেখতে পারি?

কার জন্য এ সব করবে বাবা?

তোমার মত যারা এখনও বেঁচে আছে কাকা,—বেঁচেই যদি থাকতে হয় তবে যাতে সুস্থ সবল দেহে থাকতে পারে তারই উপায়

করা প্রয়োজন। তা যদি না পার, তবে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা বিষ খেয়ে মরাও ভাল।

তাহার এই দৃঢ়তা দেখিয়া ভগবান আর কোনও কথা বলিল না। দুই তিন দিন পর্য্যন্ত ভগবান যখন কিছুতেই প্রতীবকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না, তখন নিজেও প্রতীবের এই কার্য্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। গ্রামের সর্দ্দার প্রতীবের সঙ্গে এই কার্য্যে যোগ দিলে, গজানন, নেপাল, বিপিন প্রভৃতি যে কয়জন নিম্ন জাতীয় লোক বাঁচিয়াছিল তাহারাও তাহার সহিত এই কার্য্যে যোগ দিল। প্রতীবের উপদেশ মত তাহারা নিজেরাই এই কার্য্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের সমবেত চেষ্টা দেখিয়া প্রতীবও এই কার্য্যের পন্থা বলিয়া দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মনোতোষের গৃহে যাইয়া তৃপ্তির বিবাহের আয়োজনে নিযুক্ত হইত। দিন দিন তৃপ্তির আকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে অত্যন্ত বিচলিত হইল। সেই সরলতাময়ী তৃপ্তি কেন, কিসের জন্য এমন দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে? একদিন সে তৃপ্তিকে ধরিয়া বসিল, সত্য বল্ তৃপ্তি, দিন দিন তুই কেন এমন হয়ে যাচ্ছিস্—আমার কাছে কিছু লুকাস নে বোন্।

এই কথা শুনিয়া তৃপ্তির ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। হায়! যাহাকে সে আজ স্বামীরূপে হৃদয় আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, আজ সেই কিনা একটা ফাঁকা স্তোকবাক্যে তাহাকে ভুলাইতে আসিল! তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া প্রতীব জিজ্ঞাসা

করিল, চুপ করে কেন বোন্? সত্য বল্, তোর সে পূর্ব্বের চেহারা এখন যে আর কিছুই নেই।

উদাস ভাবে তৃপ্তি বলিল—কি আর বলব? বলবার সময় চলে গিয়েছে—এখন বলে হৃদয়ে আর আগুন ছড়ান কেন?

তাহাদের কথা হইতেছে এমন সময় মালতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হচ্চে প্রতীবদা'?

তৃপ্তির কথাই জিজ্ঞাসা করছি মালতি। তার শরীর ও মনের এমন পরিবর্ত্তন কেন হ'ল? মালতি মনে ভাবিল, তৃপ্তির মনের ভাব ব্যক্ত করিবার এই উপযুক্ত সময়। সে তৃপ্তিকে বলিল, তোকে জ্যেঠামশায় ডাকছে রে বেলফুল। তৃপ্তি চলিয়া গেল।

তারপর মালতি বলিতে লাগিল, আর কিছুদিন পূর্ব্বে কেন এলে না প্রতীবদা?

কেন বল দেখি মালতি—সেদিন তৃপ্তিও ঐ কথাটা বলছিল।

মালতি।—সে আর কোনও কথা তোমায় বলেছে?

প্রতীব।—না মালতি, আর ত কোনও কথা হয় নি।

আচ্ছা প্রতীবদা!—" বলিয়া মালতি কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইল না, লজ্জা আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিল।

প্রতীব তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিল, গোপন করো না মালতি যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে অকপটে তা বল।

মালতি।—কথাটা না বলাই ভাল ছিল প্রতীব দা, কিন্তু যেটার

উপর একটী কিশোরীর জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে সে কথাটা তোমায় একবার জানিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য।

তাই যদি হয় মালতি, সে কথা খুলিয়া বল, লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা কিছুমাত্র মনে স্থান দিও না।

বলব বলেই ত তোমার কাছে এসেছি প্রতীবদা—বেলফুলের প্রাণরক্ষা তোমাকেই করতে হবে। যাহার সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে, তাহার সহিত বিবাহ হইলে সে আত্মহত্যা করিবে।

প্রতীব শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল—সে কি?

যাহা বলিলাম তাহাই ঠিক প্রতীবদা। শৈশব হইতে সে তোমাকেই স্বামীরূপে বরণ করিয়াছে। এ বিবাহে সে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু লোক লাঞ্ছনায় ও তার পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে তাহার বিদ্রোহ সফল হয় নাই—তাহার জীবন্ত সমাধিরই ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু আমি যে তৃপ্তিকে সহোদরার মতই দেখিয়া আসিতেছি মালতি, এ অবস্থায় আমাদের বিবাহ একেবারে অসম্ভব।

অসম্ভব কেন প্রতীবদা—এর মধ্যে অসম্ভব কোন্ যায়গায় দেখ্‌লে। সে তোমার সহোদরা নয়—তোমার স্বর্গগতা কাকীমার ইচ্ছা মনে পড়ে কি? কত দিন তিনি কত লোকের নিকট বলেছেন—তোমাদের দুজনের বিয়ে দিয়ে তাঁহার মনের আশা পূর্ণ করিবেন। তৃপ্তি তার মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তোমার গায়ে আত্মবলি দিয়াছে—আর তুমি—”

তাহাকে আর কোনও কথা বলিতে না দিয়া প্রতীব উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিল—না না মালতি! তা কিছুতেই হতে পারে না। কাকীমার স্তন্য পান করিয়া আমরা উভয়েই বর্দ্ধিত হইয়াছি, উভয়েই তার কোলে স্থান পেয়েছি। সে আমার সহোদরা—সহোদরার অধিক। অন্যভাবে তাহাকে দেখা উচিত নয়। আর বলিতে পারিল না, তাহার মাথাটা যেন টলিয়া গেল—একি অসম্ভব সমস্যা। আর সে সেখানে থাকিতে পারিল না—দ্রুত সে স্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

তাহার হৃদয়ে একটা আলোড়ন উপস্থিত হইল, এবং চিন্তা করিতে লাগিল, এ কি সমস্যা? তৃপ্তিকে সে তাহার ছোট বোন্‌টীর মতই দেখিয়া আসিয়াছে; সে যে তাহাতেই অনুরক্তা। এ কি কঠিন সমস্যা।

এইরূপ ভাবে যখন সে ছটফট করিতেছে, ডাকপিওন আসিয়া তাহাকে একখানি পত্র দিয়া গেল—পত্র খুলিয়া সে দেখিল, বিজলিবাবু লিখিয়াছেন, ডগ্‌লাস সাহেবের চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে—সেদিন অফিসের বড়বাবু আসিয়াছিলেন, তাহাকে পুনরায় কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য ডগ্‌লাস অনুরোধ করিয়াছেন—এবং তাহার মাহিনা ১০০৲ শত টাকা হইয়াছে।

পত্র পাঠ করিয়া সে আশ্বস্ত হইল। তখনই মনোতোষ বাবুর নিকট, কলিকাতায় যাইবার জন্য বিদায় চাহিল। কিন্তু তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তৃপ্তির বিয়েটা পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইতে হইল। বিবাহের আর সাতটা দিন বাকী ছিল।

[২১]

বিজলি বাবুর নিকট প্রতীবের সাহসের কথা শুনিয়া ভোলানাথ বাবুর প্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। এতটা বয়স পর্য্যন্ত তিনি অনেকের সহিত মেলামেশা করিয়াছেন, এ জাতির আত্মসম্মান বোধ ও সাহস তাঁহার অজানিত কিছুই নাই, তাই আজ এই যুবকের সাহসের কথা শুনিয়া, তাহার আত্মসম্মানের পরিচয় পাইয়া, তাহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এখনই প্রতীবের গ্রামে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আসেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করিয়াও তাহার গ্রামখানির কথা আদৌ জানিতে পারেন নাই, কাজেই অন্তরের ভাব অন্তরে রাখিয়া প্রতীবের আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন।

বিজলী বাবুর কথামত তিনি তিন চারি দিন অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। প্রতীবকে আসিতে না দেখিয়া প্রতীবের সম্বন্ধে তাহার চিন্তার ধারা অন্যদিকে ধাবিত হইল। একে এই দারুণ বর্ষা, তাহার উপর পল্লীগ্রাম, সেখানকার আকাশে বাতাসে, প্রতি ধূলিকণায়

ম্যালেরিয়ার বীজ পরিপূর্ণ। বৎসরের মধ্যে এই সময়টা সেখানকার দৃশ্য অতি ভীষণ, প্রতি গৃহস্থের গৃহ রোগীর বেদনা ক্ষুব্ধ স্বরে উচ্ছ্বসিত। এই সময়ে সে সেখানে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইল নাত?

এই চিন্তা তাহার মনের মধ্যে একটা অজানিত আলোড়ন উপস্থিত করিল। বিজলী বাবুর নিকট তিনি প্রতীবের পূর্ব্ব ইতিহাস শুনিয়াছিলেন। বাল্যে পিতৃমাতৃ হারা হইয়া কিরূপে পিতৃবন্ধুর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছে, যত্ন ভালবাসার পরিবর্ত্তে কতকটা নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, শেষে প্রতারিত হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি তাহার পিতৃবন্ধুকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের অদৃষ্টের অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইয়াছে।

সেখানে সে যদি অসুস্থ হইয়া থাকে তবে কত কষ্টই না ভোগ করিতে হইতেছে। পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় পিপাসায় ছটফট করিলেও হয়ত এক বিন্দু জল পাইতেছে না, ঔষধ ও পথ্যের অভাবে তাহাকে কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। এই সমস্ত চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া প্রতীবের উপর তাহার কেমন একটা ক্রোধের ভাব দেখা দিল। কেন সে দেশে না যাইয়া আমার বাটীতে আসিল না? আমি যে তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছি। তিনি ভুলিয়া গেলেন প্রতীবের সহিত তাহার মাত্র দুই তিন ঘণ্টার আলাপ। এই দুই তিন ঘণ্টার পরিচয়ে কেহই এতটা করিতে পারে না কিন্তু স্নেহের এমনি অনুশাসন যে ভোলানাথ বাবুকে এ কথাটা পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিয়াছিল।

এইরূপ চিন্তায় যখন তিনি অস্থির হইয়াছিলেন, বেলা তখন আসিয়া ডাকিল—বাবা!

কন্যাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার চাঞ্চল্য অনেকটা কমিয়া গেল, বলিলেন, বেলা, আয় মা, আচ্ছা বলতে পারিস প্রতীবের ব্যাপার কি?

বেলা।—অনেক দিন পরে গিয়েছেন তাই হয়ত ফিরে আসতে এত বিলম্ব হচ্চে বাবা, তার জন্য আপনি এত উৎকণ্ঠিত হচ্চেন কেন?

তার জন্য কেন যে এতটা অস্থিরতা তা তুই বুঝবিনি মা, তার জীবনের ইতিহাস শুনলে তুইও আমার মত ব্যাকুল হতিস মা।

বেলা।—কি রকম তার জীবনের ইতিহাস যার জন্য আপনি উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন?

ভোলা।—এত দিন তোর কাছে তার সমস্ত কথা বলি নাই, আজ তোকে তার সমস্ত ইতিহাস শুনাব—বলিয়া তিনি প্রতীবের সম্বন্ধে বিজলী বাবুর নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন একটী একটী করিয়া সমস্ত কথা বলিয়া গেলেন। কেমন করিয়া সে পৈতৃক সম্পত্তি বিনা বাধায় বিনাবাক্যব্যয়ে মনোতোষকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের ভাগ্যের অন্বেষণে বাহির হইয়াছে, কেমন করিয়া নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য ডগলাস্ সাহেবকে প্রহার করিয়াছে, প্রভৃতি সমস্তগুলি একে একে বলিয়া গেলেন।

যতক্ষণ ভোলানাথ বাবু প্রতীবের কথা বলিতে ছিলেন, বেলা

এক মনে তাহা শুনিয়া যাইতে লাগিল, কখনো বা আনন্দ ও গর্ব্বে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিতে লাগিল, কখনও বা দুঃখে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তাহার কথা শেষ হইলে বেলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আজ কালকার দিনে এমন লোক ও আছে বাবা ?

ভোলা।—আছে বৈকি মা, এই প্রতীবই ত তার একটী জ্বলন্ত প্রমান ?

বেলা।—বাস্তবিক বাবা! তাঁর কথা শুনলে, তার দুর্জ্জয় সাহসের পরিচয় পেলে আনন্দে, গর্ব্বে বুকখানা দশ হাত হয়ে উঠে।

ভোলা।—ঠিক বলেছিস মা, আর সেই জন্যই আমার এতটা ব্যাকুলতা, আমার এতখানি বয়স হল বেলা, এই বয়সের মধ্যে, অনেক কাজে অনেকের সা ন্নধ্যে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু এমন সরল, এতটা তেজ দীপ্ত, এতটা আত্মমর্য্যদা জ্ঞান-সম্পন্ন যুবক, আমার চক্ষে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রতীবের ইতিহাস শুনিয়া বেলার মন প্রতীবের প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, এই ম্যালেরিয়ার সময়ে তিনি সেখানে গেলেন কেন? তিনি ত আমাদের এই খানেই থাকিতে পারিতেন।

ভোলা।—তাই তার উচিত ছিল মা। অন্ততঃ যাবার পূর্ব্বে একবার দেখা করে গেলেও আমি সেই ব্যবস্থাই করতুম, কিন্তু তাকে

দোষী করবার কিছুই নেই মা ? মরনের হাত হতে আমাকে ফিরিয়ে আনার পর হইতেই আমি তাকে যে পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখেছি তা সে বুঝ্‌বে কি প্রকারে ?

বেলা।—আপনি যাই বলুন বাবা, যাবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার দেখা করে যাওয়া উচিত ছিল। সহসা ভোলানাথ বাবুর দৃষ্টি দ্বার দেশে পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন—এই যে প্রতীব, এস বাবা এস, এইমাত্র আমরা পিতা পুত্রীতে তোমার নাম করিতেছিলাম। তারপর ? দেশে বেশ ভাল ছিলে ত ?

প্রতীব মৃদু হাসিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, সেখানে বেশ ভালই ছিলাম। বেলা মৃদু হাসিয়া তিরস্কারের সহিত বলিল, আপনি কিরূপ লোক বলুন ত। বাবা আপনার জন্য ভাবেই আকুল, আর আপনি সেখানে পাণ্ডবদের মত এমন অজ্ঞাত বাসে রহিলেন, যে, আপনার খোঁজ পাবারই যো নেই।

তারপর এই তিন জনের মধ্যে কত কথা হইল, গ্রামের কথা, তাহার চাকুরির কথা ইত্যাদি অনেক বিষয়েই আলোচনা হইল। চাকুরির কথা উঠিতে ভোলানাথ বাবু বলিল, না বাবা প্রতীব, তোমার মত যুবকের দাসখতে নাম লিখাইয়া ব্যক্তিত্ব নষ্ট করা উচিত নয়। তোমার কাজ কর্ম্মের বিষয় পরে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে।

প্রতীব ও তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া বিদায় চাহিলেন।

ভোলানাথ বাবু তৎপর দিবস আবার আসিবার জন্য বলিয়া দিলেন, প্রতীব ও স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

প্রতীব চলিয়া গেলে ভোলানাথ বাবু কন্যাকে বলিলেন, দেখ্ দেখি মা, কথাবার্ত্তায় চাল চলনে, এমন বাঙ্গালীর ছেলে আজ কাল আর দেখিতে পাওয়া যায় কি? বেলা কোনও উত্তর দিল না, কিন্তু পিতার এই কথায় তাহার হৃদয়ে একটী আনন্দের তুফান খেলিয়া গেল।

ভোলানাথ বাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রতীব প্রত্যহ একবার করিয়া কোনও দিন বা দুইবার তাহার বাটীতে আসিতে লাগিল। তাহাকে আসিতে দেখিলে ভোলানাথ বাবু ও তাহার কন্যার প্রাণ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তাহাদের আদর অভ্যর্থনায় প্রতীব তাহাদের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। হইবারই কথা, আন্তরিক আদর যত্নে, ঐকান্তিক ভক্তিতে ঈশ্বর ও অনুকুল হন, প্রতীব ত কোন ছার। বাল্যকাল হইতে পিতৃ স্নেহ বর্জ্জিত প্রতীব, ভোলানাথ বাবুর নিকট পিতার অধিক স্নেহ যত্ন পাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

প্রথম দু এক দিন কাটিয়া গেল, বেলা দ্বিধা শূন্য চিত্তে প্রতীবের সহিত মেলামেশা করিতে লাগিল। ভোলানাথ বাবুর অনুপস্থিতিতে প্রতীব আসিয়া পড়িলে বেলা তাহাকে ছাড়িয়া দিত না, নানা বিষয়ের আলোচনায় তাহাদের সময় কাটাইয়া দিত। তাহাদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল বাঙ্গালী জাতি নকলনবিসী ছাড়িয়া, ভিন্ন জাতির অনুকরণ ছাড়িয়া আবার তাহারা কিরূপে ঠিক বাঙ্গালী

জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, প্রতীব সেই সমস্ত বিষয়ের বক্তৃতা দিয়া যাইত, বেলা একাগ্র মনে তাহাই শ্রবণ করিত। তাহার যুক্তি খণ্ডন করিবার মত শক্তি ও সাহস তাহার থাকিত না। পিতার আদরে সে অনেকের সহিত মেলামেশা করিয়াছে বটে, কিন্তু ঠিক এমন লোক তাহার চক্ষে একটীও পড়ে নাই। এমন সরল প্রাণ খোলা লোক কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আজ সে প্রতীবের অনুকম্পায় এক নূতন আলো দেখিতে পাইয়াছে। এই নূতন আলো পাইয়া বুঝিতে পারিল এত দিন যেটাকে সে আলো বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছে, সেটা অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু নয়।

আজ তাহার জীবনের ভাব ধারা বদলাইয়া গেল। প্রতীবের এক একটী কথা যেন দেবতার বাক্য বলিয়া মানিয়া লয়, তাহার সঙ্গ দেবতার সঙ্গ বলিয়া মনে হয়, হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসার ডালি লইয়া প্রতীবের পাদমূলে দণ্ডায়মান থাকিতে ইচ্ছা হয়। একদিন যদি কোনও কারণে প্রতাব না আসিতে পারে তবে সে দশদিক অন্ধকার দেখে, সে দিন তাহার কাজ কর্ম্ম, গীত বাদ্য কিছুই ভাল লাগে না। পিতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধা হইলে পিয়ানোর নিকট বসিয়া যদি বা গান করে, সে গানে যেন সুর থাকে না, মুর্চ্ছনা থাকে না—সবই যেন বেসুরো এলোমেলো হইয়া যায়। ইহার কারণ বৃদ্ধ ভোলানাথ বাবুর অজানিত থাকে না—কন্যাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিতেন—ছোঁড়াটা এমনই মায়াবী বেলা, যে একদিন

তাহাকে না দেখ্‌লে প্রাণটা বড় ছটফট করে মা। বেচারা পিতৃ মাতৃ হারা, আমার ইচ্ছা তাকে আমার :বাটীতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করি কিন্তু যদি সে "না" বলে ? শুনিয়া বেলার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া যাইত ? কোনও কথা বলিতে পারিত না।

নিজের অজানিত ভাবে, বেলা এই ভাবে প্রতীবের পায়ে তাহার জীবন যৌবন সমস্ত অর্পণ করিল। এখন প্রতীব যা করে, যা বলে তাই যেন তাহার চক্ষে সুন্দর, অতি সুন্দর বলিয়া মনে হয়। প্রতীব যতক্ষণ তাহাদের নিকট থাকিয়া গল্প গুজব করে ততক্ষণ তাহার প্রাণ আনন্দে ভরপূর থাকে। প্রতীব যখন পল্লীর করুণ কাহিনীর গল্প করে তখন সে অনন্যমনা হইয়া তাহা শ্রবণ করে এবং তাহাতে আত্মহারা হইয়া যায়।

এইরূপ ভাবে কিছু দিন কাটিয়া গেল। প্রতীবের অনাবিল চরিত্র, সরল অনাড়ম্বর চাল চলন ভোলানাথ বাবুকে এত মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, যে, তিনি তাহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে আপনার জন করিয়া লইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতীব বা বেলাকে কোনও কথা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, এবং তাহাদের এই অবাধে মেলামেশায় বাধা স্বরূপ হইয়া ও দাঁড়ান নাই।

প্রতীবকে ডগলাস সাহেব পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু ভোলানাথ বাবু কিছুতেই তাহাকে সে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দিলেন না। এত বড় একজন

বৌভাত

স্বাধীনচেতা উদার যুবককে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত উত্তম আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করিয়া দিতে তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। কোনও একটী স্বাধীন ব্যাবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে তাহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্থের অপ্রতুল নাই, দশ বিশ লক্ষ টাকা তিনি অনায়াসে একটা ব্যবসায়ে খাটাইতে পারেন, কিন্তু এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এক দিন প্রতীব আসিলে নানা কথার পর এই বিষয় উত্থাপন করিলেন এবং তৎপর দিবস পরামর্শ করিবার জন্য তাহাকে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

ভোলানাথ বাবুর অর্থ সাহায্যে এবং ব্যবসায়ের পরামর্শমত প্রতীব লিথিগুড়ি, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে কাঠের জঙ্গল ইজারা লইল এবং দশ বারটী কয়লার ও অভ্রের খনি ক্রয় করিয়া কাজ আরম্ভ করিল। এই অনুষ্ঠানের জন্য কলিকাতা ডালহৌসি স্কয়ারের মোড়ে এক প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটী ভাড়া লইয়া অফিস খুলিয়া অনেক বাঙ্গালী যুবকের অন্নের সংস্থান করিয়া দিল। কার্য্য আরম্ভ করিবার মুখে ভোলানাথ বাবু দুই এক জন ইংরাজ ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে চাহিলেন কিন্তু প্রতীব কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। অনর্থক এতগুলা টাকা বিদেশীর পকেটে দিয়া কি লাভ ; তাহা অপেক্ষা সেই বেতনটা এদেশীয় যোগ্য ব্যক্তিকে দিতে পারিলে তাহার দ্বারা আরও বেশী কাজ পাওয়া যাইবে। প্রতীব এমন ভাবে ভোলানাথ বাবুর যুক্তি খণ্ডন করিতে লাগিল, যে, তিনি আর কথা কহিলেন না।

যে বেতনে একজন সাহেব ম্যানেজার রাখা যায়, প্রতীব সেই বেতনে কাষ্ঠ বিভাগে, অভ্র বিভাগে এবং কয়লা বিভাগে তিন জন যোগ্য দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কার্য্যেনিপুণ বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করিল। এই তিন জন ভদ্র লোক যে যে বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন, সেই

সেই বিভাগের কাজে বিশেষ পারদর্শী। এতদিন তাঁহারা বহু স্থানে কাজ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এত অধিক বেতন তাঁহারা কোথাও পান নাই, কাজেই ভোলানাথ বাবুও প্রতীবের প্রতিষ্ঠিত B. P. & Coর অফিসটার উন্নতির জন্য তাঁহারা প্রাণ ঢালিয়া দিলেন।

প্রতীব অফিসে অধিক পরিমাণে কর্ম্মচারী নিয়োগ করে নাই। কাজ চালাইতে যে কয়জন লোকের প্রয়োজন, ঠিক সেই কয় জনই রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে এত অধিক হারে বেতন দিত, যে, তাহারা সহাস্য মুখে দুই তিন জনের কাজ এক জনেই করিয়া যাইত, পরিশ্রম তাহাদের গায়ে লাগিত না।

প্রথম যখন কলিয়ারি ক্রয় করা হইয়াছিল তখন, তাহাতে অনেক সাহেব ম্যানেজার ছিল—ক্রমে ক্রমে সে সকলকে জবাব দিয়া তাহাদের স্থানে বাঙ্গালী ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া প্রতীব এইটাকে পূর্ণ বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ভোলানাথবাবু ও প্রতীব প্রত্যহই অফিসে আসিতেন। মধ্যে মধ্যে প্রতীব কয়লার ও অভ্রের খনি পরিদর্শনে যাইত। সকলের এইরূপ সমবেত চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটা দ্রুত গতিতে এরূপ উন্নতির পথে চলিল, যে তাহা দেখিয়া অনেক ইংরাজ ব্যবসাদারও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যে জাতির প্রতিষ্ঠান অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়, যে জাতির ব্যবসায় বুদ্ধি আদৌ নাই বলিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে মর্ম্মময় অক্ষরে লিখিত, সেই জাতির এই প্রতিষ্ঠানটীকে এত উন্নতি লাভ করিতে দেখিলে কে না আশ্চর্য্য হইবে?

কর্ম্মচারিদের কার্য্য কুশলতায় প্রথম বৎসরেই এই প্রতিষ্ঠানের লাভ হইল প্রায় চারি লক্ষ টাকা, যে দিন হিসাবে এই লাভের অঙ্ক বাহির হইল তাহার পর দিন কর্ম্মচারিগণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এক লক্ষ টাকা তাহাদের পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ "B. P. & Co. Bonus" দান করিয়াছেন। সকল কর্ম্মচারিকেই বেতনের অনুসারে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। অফিসময় একটা আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। যে ধারণা তাহারা একদিনও স্বপ্নে আনিতে পারে নাই—যেটা সম্পূর্ণ আকাশ কুসুম—সেইটাকে চক্ষের সম্মুখে ঘটিতে দেখিলে প্রাণে এমনই আনন্দ হয়। কর্ম্মচারিগণ যখন আনন্দ কোলাহলে মগ্ন, চাপরাসী আসিয়া সংবাদ দিল সাহেব তাহাদিগকে মিটিং ঘরে ডাকিতেছেন। সাহেবের আহ্বান শুনিয়া সকলেই তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। ভোলানাথবাবু তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, এই সামান্য পুরস্কারে আপনারা যেরূপ আনন্দিত হইয়াছেন, আমার প্রাণে আরও বেশী আনন্দ হইতেছে যে প্রতীব আপনাদিগকে এতটা আনন্দ দিতে পারিয়াছে। আপনারা সকলে জানিয়া রাখুন, আপনাদের পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠান হইতে আমি যে লাভ পাইব তাহার এক চতুর্থাংশ প্রতি বৎসরেই আপনারা পাইবেন ; তাহা হইতে কিছুতেই বঞ্চিত হইবেন না। শুনিয়া সকলে উল্লাস ধ্বনি করিল এবং ভোলানাথবাবু ও প্রতীবের জয় ধ্বনি করিল। তিনি বলিলেন, দেখিবেন প্রতি বৎসর যেন আপনাদের এইরূপ উল্লাস দেখিতে পাই। আফিসের টাকা আমার কিন্তু আফিস

আপনাদের। আপনাদের কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার হতে আপনারা কখনও বঞ্চিত হবেন না। সকলে আনন্দিত হৃদয়ে যে যাহার কর্ম্মে মন দিল।

ভোলানাথবাবুও প্রতীবের এইরূপ উচ্চহৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আফিসের কর্ম্মচারিগণ এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য বিশেষরূপ পরিশ্রম করিতে লাগিল। এই তিনটী বিভাগ ভিন্ন তাহারা আরও নানা বিভাগ খুলিতে মনস্থ করিয়া প্রতীব ও ভোলানাথবাবুকে তাহাদের অন্তরের কথা জানাইল। তাঁহারাও তাহাদের প্রস্তাবে মত দিলেন; এবং একটী কাপড়ের কল চালাইবার স্থির করিলেন।

প্রতীবের মন প্রাণ এখন আনন্দে বিভোর। দুঃখ দারিদ্রের মধ্য দিয়া ঘটনা স্রোতে গা ভাসাইয়া আজ সে উদার হৃদয় লোকের অনুকম্পায় ভাগ্য লক্ষ্মীর সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছে। ভোলানাথবাবুর পরামর্শে সে এখন সমিতির সব ছাড়িয়া পৃথক একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে বাস করিতেছে। ভোলানাথ-বাবু তাহাকে নিজের বাটীতেই থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ছিলেন কিন্তু প্রতীব কি জানি কি ভাবিয়া তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু প্রত্যহ পূর্ব্বের ন্যায় সকাল ও সন্ধ্যায় তাহাদের বাটীতে আসিত।

একটা প্রয়োজনীয় কাজের জন্য প্রতীবকে কলিয়ারিতে যাইতে হইল। মজুরগণ তাহাদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য ম্যানেজারের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়াও যখন কিছুতেই ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা এক জোটে কাজ বন্ধ করিয়া ভিন্ন খাদে কাজ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল, কিন্তু সর্দ্দারগণ তাহাদের দল গুলিকে সংযত করিয়া রাখিল। তাহারা জানিতে পারিল তাহাদের আবেদন নিবেদন তাহাদের দয়ালু মনিবের নিকট পৌছায় নাই, ম্যানেজার নিজেই চাপিয়া রাখিয়াছিল।

প্রথমে তাহারা মনে করিয়াছিল, মনিব আসিলে নিজেরা তাহাদের অভাবের কথা জানাইবে। এই আশায় ছয় মাস কাটিয়া গেলে প্রতীব না আসাতে বাধ্য হইয়া তাহারা কাজ বন্ধ করিয়া দিল। ম্যানেজার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদিগকে পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিল না। অগত্যা বাধ্য হইয়া প্রতীবকে তার করিলেন "come sharp coolies stopped their work." টেলিগ্রাম পাইয়া প্রতীব তাড়াতাড়ি কলিয়ারী রওনা হইল।

প্রতীব কলিয়ারী পৌছিয়া দেখিল, দিবারাত্র কর্ম্ম কোলাহল মুখরিত তাহার কয়লার খাদ নিস্তব্ধ মরুভূমি সদৃশ হইয়াছে। দশ বারটী খাদের একটী খাদও চলে না। দশ বারটী বয়লারের একটী চিমনি হইতেও ধুঁয়া উঠে না। বাসায় যাইবার পূর্ব্বেই সে কুলি ধাওড়ার নিকট যাইয়া দেখিল প্রায় শতাধিক কুলি এক স্থানে বসিয়া গান করিতেছে, তাহাকে দেখিয়াই তাহারা আনন্দে উল্লাস ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রতীব কোনও কথা না বলিয়া পকেট হইতে একশত টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল—আজ তোমরা স্ফূর্ত্তি কর কিন্তু কাল হইতে সব কাজে লাগিও—বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে স্থান ত্যাগ করিল এবং ম্যানেজারের বাঙ্গলায় যাইয়া উঠিল।

প্রতীবকে আসিতে দেখিয়া ম্যানেজার বাবু সাদরে অভ্যর্থনা করিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর প্রতীব কুলিদের কার্য্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্য জানিয়া লইল। যখন সে শুনিল কুলিরা যে বেতন পায় তাহাতে তাদের পেট ভরে না, সেই মজুরি বৃদ্ধির মানসে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়া আছে, তখন তাহার নিজের পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। অভাবের যে কি দারুন জ্বালা তাহা সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল; তাই আজ কুলিদের মজুরি বৃদ্ধির কথা শুনিয়া তাহাদের সর্দ্দারগণকে ডাকাইয়া প্রতি টবে দুই পয়সা বাড়াইয়া দিলেন, কামিনদেরও মজুরি বৃদ্ধি হইল, উপরন্তু পূজায় তাহাদের এক জোড়া করিয়া কাপড় ও পাঁচ টাকা <কসিস ব্যবস্থা করিয়া দিল, কুলিরা

দুই হাত তুলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল এবং পর দিন হইতে পুনরায় সকলে কাজে লাগিয়া গেল।

দুই তিন দিন কলিয়ারিতে অবস্থান করিয়া প্রতীব ধানবাদ ষ্টেশনে বম্বে মেলে উঠিল। তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল, ট্রেণে উঠিয়া দেখিল, সেই কামরায় সঙ্গীহীন হইয়া একটী যুবতী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আধুনিক ধরণের বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়া মলিন মুখে ভীতিশঙ্কুলচিত্তে এক পার্শ্বে বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখের আসনে একজন যুবক উপবিষ্ট। প্রতীবও এক স্থানে আসন দখল করিয়া বসিল। বীরপুঙ্গব তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা একটু সাবধানে রহিল, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য, মনে ভাবিল ইহাকে আবার ভয়? এই ভাবিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল।

প্রতীব এই যুবকটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল? দেখিল, যুবতী মহিলাটীকে এই সভ্য যুবকটী মৃদু হাসিয়া অভদ্র ইঙ্গিত করিতেছে, আর মহিলাটি ভয়ে জড়সড় হইয়া ঘাড় হেট করিয়া বসিয়া আছে। দেখিয়া প্রতীবের আপাদমস্তক রাগে ফুলিয়া উঠিল, মাথার ভিতর রিঁ রিঁ করিতে লাগিল, এই দৃশ্য তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। এই অনুকরণ প্রিয় সমাজের জন্য লজ্জায় ঘৃণায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কি সাহসে সঙ্গিহীন অবস্থায় এমন বিবি সাজিয়া রেল পথে যাইতে সাহস করে, কি সাহসে তাহারা স্বাধীন জাতির অনুকরণ করিতে যায়? স্বাধীন জাতির একজন মহিলার গাত্রে হাত দাও দেখিবে সমস্ত জাতি ইহার বিরুদ্ধে

অভিযান করিবে। তাহাদের জাতীয় গৌরব তাহাদিগকে বিপদে রক্ষা করে। কিন্তু যাহাদের জাতীয় গৌরব এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাহারা সকল বিষয় পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী তাহাদের স্ত্রীলোকদের এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা—অসহায় অবস্থায় নকল বিবি সাজিয়া একা রেল পথে ভ্রমণ—বিপদজনক কেন না হইবে।

এই যুবকটীর অভদ্র ঈঙ্গিত প্রতীবের চক্ষে পড়িবামাত্র প্রতীব তাহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিল, কিন্তু যুবকটী তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। সামান্য এক জনের রক্ত চক্ষুকে ভয় করিতে গেলে তাহার প্রাণের আশা মিটিবে কেন? তাহার অন্তরে কামপ্রবৃত্তি গর্জ্জিয়া উঠিল, সে প্রতীবকে একটা শৃগাল কুকুরের মতই জ্ঞান করিল। আবার মহিলাটীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া নিজের আসন হইতে উঠিয়া মহিলাটীর আসনের পার্শ্বে যাইয়া বসিল। মহিলাটী নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া ছল ছল নেত্রে প্রতীবের দিকে চাহিল। প্রতীব আর সহ্য করিতে পারিল না, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, ও আসন ত্যাগ করিয়া নিজের আসনে ফিরিয়া যাও, কিন্তু কে তখন ফিরিয়া যায়? সয়তান তাহার স্কন্ধে ভর দিয়াছে— সেও সমান ভাবে উত্তর দিল—চুপ কর শূয়ার, একটা ঘুসিতে তোর মাথার খুলি উড়াইয়া দিব।

যুবতীটী তাহার ভাবী বিপদ বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি সেই আসন হইতে যেই উঠিতে গেল অমনি উদ্ধত যুবকটী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, যুবতী তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য

সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু সে দৃঢ় মুষ্টি হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া কাতর কণ্ঠে প্রতীবের সাহায্য ভিক্ষা করিল। প্রতীব আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া যুবকটীকে এমন ভাবে একটি ঘুসি দিল যে, তাহার মাথা ঘুরিয়া পড়িল, কিন্তু সেও এই অপমান নীরবে সহ্য করিতে পারিল না; মহিলাটীকে ছাড়িয়া দিয়া সে প্রতীবের উপর পড়িল। মহিলাটী সেই স্থান হইতে উঠিয়া প্রতীবের আসনে যাইয়া বসিল।

মেল দ্রুত গতিতে তাহার গন্তব্য পথে চলিতেছে, প্রতীব ও সেই যুবকটীর মধ্যে ভীষণ মারামারি চলিতেছে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি নাই। প্রতীব যুবকটীকে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল। মহিলাটী ভাবী বিপদের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি ট্রেণের বিপদ সূচক শৃঙ্খল টানিয়া দিল। পথের মধ্যেই ট্রেণ থামিয়া গেল, গার্ড প্রভৃতি আসিয়া প্রতীব ও যুবককে ধরিল। পুলিশ গার্ডের কথামত যুবকটীকে ছাড়িয়া প্রতীবকে গ্রেপ্তার করিল, কারণ গার্ড সাক্ষ্য দিয়াছে এই যুবকের বুকের উপর বসিয়া প্রতীব তাহাকে প্রহার করিতেছিল। যুবকটী গার্ডের পরিচিত ছিল, বোধ হয় আগে থেকে উভয়ের ভিতর ষড়যন্ত্র ছিল। মহিলাটী প্রতীবের পক্ষে সাক্ষ্য দিল কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না, প্রতীবকে হাজতে যাইতে হইল।

এই সংবাদ যথা সময়ে ভোলানাথ বাবুর নিকট পৌঁছিল। বেলা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পিতাকে যথা কর্ত্তব্য করিবার জন্য কাতর

ভাবে অনুরোধ করিল। ভোলানাথ বাবু কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং বহু চেষ্টায় তাহাকে জামিনে মুক্তি করিয়া আনিলেন।

যথা সময়ে আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। প্রতীবের পক্ষে উকিল ব্যারিষ্টারের অভাব ছিল না, সকলেই প্রতীবকে বাঁচাইবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিল। যে মহিলাটীর জন্য প্রতীবের আজ এই অবস্থা, তিনি আসিয়া প্রতীবের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন; কিন্তু গার্ড ও তাহার সঙ্গী কয়েকজন প্রতীবের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিল, যে, প্রতীব যুবকটীর বুকের উপর চাপিয়া তাহাকে প্রহার করিতেছিল। মহিলাটীর বিরুদ্ধেও অনেক কটাক্ষপাত হইল।

বাদী পক্ষের উকিল আসামীর বিরুদ্ধে তাহার যুক্তি তর্ক দেখাইয়া আসামীর শাস্তি বিধানের বিচার চাহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। প্রতীবের ছয় মাস বিনাশ্রম শ্রীঘর বাসের আজ্ঞা দিলেন। প্রতীব হাসিমুখে এই দণ্ডাদেশ মাথা পাতিয়া লইল। বেলা ও ভোলানাথ বাবু এই মোকদ্দমার বিচার দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, এই দণ্ডাদেশ শ্রবণমাত্র বেলার চক্ষে জল আসিল, প্রতাব তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ভয় কি বেলা—ছয় মাস পরে আবার তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

প্রতীবের দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া বেলার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। একজন অসহায়া স্ত্রীলোককে একটা কামান্ধ পশুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া তাহার ছয় মাস কারাদণ্ড হইল। প্রতীবের দুরদর্শিতা যে কত অধিক আজ তাহার মনে বার বার উঁকি মারিতে লাগিল। যে জাতি আত্মরক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইলে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হয়, সে জাতীর এত অনুকরণ চিকীর্ষা কেন? যে জাতি তাহার জননী, ভগিনী, স্ত্রীকে কামান্ধ পশুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে জাতির নারী স্বাধীনতার স্বার্থকতা কি? আর সেই দেশের রমণীরাই বা কোন্ সাহসে এমন সঙ্গীহীন অবস্থায় পথে বাহির হয়? এই যে একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল—সেদিন প্রতীববাবু যদি সেস্থানে না থাকিতেন—তবে সেই যুবতীর কি অবস্থা হইত? তাহার সতীত্ব এক মুহূর্ত্তে ধূলায় লুটাইত।

আমাদের এই ভুলের সংশোধন করিতেই হইবে, এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে! বাঙ্গালী আমরা আমাদের জাতীয়ত

রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এখন হইতে আচার ব্যবহারে বেশ ভূষায়, চাল চলনে ধার করা সভ্যতা ছাড়িয়া আমাদের জাতীয়তা রক্ষা করিয়া চলিব। অনুকরণ ছাড়িয়া যথার্থ ভাবে বাঙ্গালীর মেয়ের মতই থাকিব।

যখন সে এই ভাবনায় বিভোর তখন দয়াল আসিয়া ডাকিল—মিসিবাবা।

আজ এই ডাক শুনিয়া সে লজ্জায় মরিয়া গেল। এই নামটাই এতদিন তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু আজ তাহার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে হইয়া থাকা, তাই দয়ালের এই ডাক তাহার কর্ণে বিশ্রী বোধ হইল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, বলিল, দয়াল! এবার হইতে তুমি আমায় ও নামে ডাকিও না। দিদিমণি বলিয়া ডাকিবে, ও নাম আর আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না।

তাহার কথা শুনিয়া, দয়াল বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না। বেলা বলিতে লাগিল—তুমি আজ সকলকেই বলে দেবে তারা যেন আর আমাকে ও নামে না ডাকে। এখন কি বল্‌তে এসেছিলে দয়াল? "দিদিমণি! প্রতীব বাবুর গ্রাম হতে দুইজন লোক আসিয়াছে—তারা বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চায় কিন্তু বাবু ত এখন বাড়ীতে নাই।"

কি নাম জিজ্ঞাসা করেছ দয়াল?

একজনের নাম বলতে পারিনে তবে আর একজনের নাম ভগবান।

প্রতীবের মুখে ভগবানের নাম, অনেকবার শুনিয়াছিল। ভগবান আসিয়াছে শুনিয়া বেলা বলিল, তাহাকে শীঘ্র এখানে লইয়া এস।

দয়াল চলিয়া গেলে, বেলা ভগবানের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। প্রতীবের নিকট শুনিয়াছিল—এই ভগবানের হৃদয় উদার, ধরিত্রীর মত তার সহ্য গুণ, দধীচির মত পরোপকারী। বেলা উৎকণ্ঠিত ভাবে ভগবানের দর্শন লাভের জন্য বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার উৎকণ্ঠা দূর করিয়া কটিবাস পরিহিত হইয়া নগ্ন গাত্রে ভগবান তথায় আসিয়া বেলাকে প্রণাম করিল। বেলা ভগবানকে দেখিয়া সাদরে বসিতে দিল। তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিল, যেন তাহার সহিত কতদিনের আলাপ, কতদিনের জানাশুনা। ভগবান সজল নেত্রে প্রতীবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বেলা পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া ভগবানের প্রাণ আনন্দে, গর্ব্বে স্ফীত হইল, তাহার মনে হইতে লাগিল প্রতীবকে যে সে প্রাণ খুলিয়া শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে এতদিন পরে তাহার সার্থক হইয়াছে। বেলাকে বলিল, হ্যা মা শুনিয়াছি জেলে আসামীদিগকে দেখিতে দেয়, একবার প্রতীবকে দেখাতে পার মা—

এমন সময় ভোলানাথ বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ভগবানকে তিনি কখনও দেখেন নাই, তবে প্রতীবের মুখে তাহার নাম

শুনিয়াছিলেন মাত্র। তাহাকে দেখিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল—এ কে মা ?

বেলা হাসিয়া বলিল, প্রতীব বাবুর ভগবান কাকা বাবা। প্রতীব বাবুর জেলের কথা শুনে তাঁকে একবার দেখবার জন্য ছুটে এসেছেন।

ভোলানাথ বাবু তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং প্রতীবের সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাহাদের সদয় অমায়িক ব্যবহার, প্রাণ খোলা কথাবার্ত্তা সাদর যত্ন ভগবানকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিল। ভগবান যে কয়দিন তথায় রহিল, ভোলানাথ বাবু নিজের মোটরে লইয়া তাহাকে নানা স্থান দেখাইল। কালীঘাটের ৺কালীমাতা দর্শন করাইল। একদিন জেল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ভগবানকে লইয়া প্রতীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন।

প্রতীবকে দেখিয়া ভগবানের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। তাহাকে বুকে ধরিয়া মাথায় হাত দিয়া তাহার এই কার্য্যের জন্য অশেষ প্রশংসা করিল। প্রতীব গ্রামের সকলের সংবাদ জানিতে চাহিল, ভগবান সকলের সংবাদ বলিল কিন্তু মনোতোষ বাবুর সংবাদ বলিল না দেখিয়া প্রতীব তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার আগ্রহাতিশয্যে ভগবান বলিতে বাধ্য হইল, বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে বৈধব্য যন্ত্রণা লইয়া তৃপ্তি পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে এবং মনোতোষ বাবুর স্ত্রী ইহজগত হইতে চির বিদায় গ্রহণ

করিয়াছেন। তৃপ্তির বৈধব্যের কথা শুনিয়া প্রতীবের মাথায় যেন বাজ পড়িয়া গেল, দরবিগলিত ধারে দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। ভোলানাথ বাবু ও ভগবান তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া চলিয়া আসিলেন।

মনোতোষ বাবুর এখন আর পূর্ব্বের সে অবস্থা নাই। তাহার একমাত্র কন্যা তৃপ্তি যখন এক বৎসরের মধ্যে হাতের লোহা খুলিয়া বিধবার বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার প্রাণের মধ্যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তখন মালতির কথা বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল, স্ত্রীর প্ররোচনায় যদি এই কচি মেয়েটাকে একটা ঘাটের মড়ার হাতে তুলিয়া না দিয়া—প্রতীবের হাতে দিতাম তবে তার জীবন কত সুখের, কত মধুময় হইত? আমার এই বিপুল অর্থরাশী ভোগ করিবার জন্য একটা পুত্র পর্য্যন্তও নাই। সমস্তই ত তৃপ্তির, তবে কেন তাহার প্রতি এমন অবিচার করিলাম, তখন কেন আমার এমন মতিভ্রম হইল। হা ভগবন! এই কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল?—প্রতীবের বিপুল সম্পত্তি গ্রাস করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিয়া যে পাপ করিয়াছি তাহারই শাস্তি আরম্ভ হইল। এ শাস্তির কি শেষ আছে?—এই সমস্ত চিন্তায় তাঁহার দেহ দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, মাতঙ্গিনী কত বুঝাইত, কত সান্ত্বনা দিত কিন্তু সবই

নিষ্ফল হইয়া যাইত। তৃপ্তিকে নিকটে পাইলে ছল ছল নেত্রে তাহাকে বলিত, বড় ভুল করেছি মা—তোর প্রতি যে অবিচার করেছি, সে ভূলের মার্জ্জনা নাই মা, হা ভগবন্! আর তিনি বলিতে পারিতেন না, চক্ষের জলে সমস্ত ঝাপসা হইয়া যাইত। তৃপ্তি কত বুঝাইত, কত কাঁদিত কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইত। মনোতোষের অনুতপ্ত হৃদয় কন্যার সান্ত্বনায় তৃপ্তি লাভ করিত না বরং অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে আরও ক্ষত বিক্ষত হইত।

পিতার অবস্থা দেখিয়া তৃপ্তি চক্ষের জলে বুক ভাসাইত, দেবতার পায়ে মাথা কুটিত, তাহার হৃদয় পিতার দুঃখে ভরিয়া উঠিত, সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে কাছে থাকিয়া পরিচর্য্যা করিত।

ভগবানের মার, বড় মার। আজ তুমি অসীম তেজে নিরীহ দুর্ব্বলের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছ কিন্তু কাল কোন দিক দিয়া কিরূপে যে সেই সম্পত্তি তোমার হাত ছাড়া হইবে, তোমায় পথের ভিখারী করিয়া দাঁড় করাইবে, তাহা তুমি জানিতেও পারিবে না। মনোতোষ একদিন অর্থবলে বলীয়ান হইয়া প্রতীবকে প্রতারণা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল, তাহাকে চক্ষের জলে দেশত্যাগী করিয়াছিল আর আজ তাহার সেই সম্পত্তি ভোগ দখল করিবার কেহ নাই, এক মাত্র কন্যা তৃপ্তি সেও আজ তাহারই অদৃষ্ট দোষে বৈধব্য জ্বালায় জর্জ্জরিত।

মনোতোষ মাতঙ্গিনীকে বিষ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, সেই এ সুখের সংসারকে অশান্তির আগুনে পুড়াইবার কারণ।

মাতঙ্গিনী কাছে আসিলে হিংস্র শার্দ্দুলের মত জ্বলিয়া উঠিত। স্বামীর এই ভীষণ মুর্ত্তি দেখিয়া সে ভয়চকিতা কুরঙ্গিনীর মত দূরে পলাইয়া যাইত। এই অবস্থা দেখিয়া তাহার শরীর ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে সর্ব্বদাই মনে করিত তৃপ্তির অকাল বৈধব্যের সেই একমাত্র কারণ। তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে কিন্তু তাহার সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে বেশী দিন ভুগিতে হইল না, তাহার কৃতকার্য্যের হিসাব দিবার জন্য তাহাকে শীঘ্রই প্রস্থান করিতে হইল।

মনোতোষের হৃদয় এখন শ্মশানের মত ফাঁকা হইয়া গেল। আহারে সুখ নাই, বিশ্রামে শান্তি নাই, নিদ্রায় তৃপ্তি নাই, সব সময় যেন বিভীষিকায় আচ্ছন্ন। গ্রামের কেহ দেখা করিতে আসিলে দেখা করেন না। কথাবার্ত্তাও বড় একটা কহেন না। এখন তাঁহার এক মাত্র আকাঙ্খা, একবার প্রতীবকে পাইলে তাহার বিষয় তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সুখে মরিতে পারে। তৃপ্তির নিকটও দুই একদিন সেই কথাই বলিয়াছিল। তৃপ্তি ও আনন্দের সহিত তাহাতে সায় দিত এবং বলিত, বাবা, তার বিষয় তাকে প্রত্যর্পন করুন। ভগবান তোমার ভাল করিবেন; তোমার কি অভাব আছে বাবা? এরকম পাগলের মত হয়ে থাকা অপেক্ষা তার বিষয় তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বরং চল বাবা কিছু দিন তীর্থ পর্য্যটন করে আসি। শুনিয়া মনোতোষ বলিয়াছিল, তুই ঠিক বলেছিস মা, তাকে একখানা চিঠি লিখেদে, যেন সে শীঘ্র আসে। আমার এ অবস্থার কথা জানতে পারলে সে

কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না, মা। আজ বিকালে যখন পিয়ন আসবে তখন এক খানা খাম কিনে রাখিস।

কথা মত সেই দিন অপরাহ্ণে যখন পিয়ন তাহাদের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দিতে আসিল তৃপ্তি এক খানা খাম কিনিয়া রাখিল। রাত্রে প্রতীবকে পত্র লিখিবে। প্রতীবের ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইবামাত্র দেশী ও ইংরাজি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রচার হইল। B. P. Co.র অংশীদার প্রতীব বাবু ধানবাদ হইতে আসিবার পথে ট্রেণে একটী স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে যাইয়া এক জন যুবককে প্রহার করায় তাহার ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইয়াছে। মনোতোষ ইহা পাঠ করিয়া, ওরে সর্ব্বনাশ হয়েছেরে তৃপ্তি, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

কি হয়েছে বাবা, বলিয়া তৃপ্তি ছুটিয়া আসিল। মনোতোষ কিছু বলিতে পারিল না, কেবল সংবাদ পত্রের যে স্থানটাতে প্রতীবের জেলের সংবাদ ছাপা ছিল সেই সমস্তটা অঙ্গুলী দ্বারায় দেখাইয়াদিল। তৃপ্তি পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মনোতোষ বাবু নিজেই কলিকাতায় ছুটিয়া যাইতে চাহিলেন কিন্তু তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার জন্য তৃপ্তি তাহাকে যাইতে দিল না, ভগবানকে ডাকিয়া পাঠাইল।

ভগবান সমস্ত শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তৃপ্তির অনুরোধে ও নিজের আগ্রহে পাড়ার রমেশ ঘোষালকে সঙ্গে লইয়া তৎপর দিবস কলিকাতায় রওনা হইল।

ভগবান যে কয় দিন ভোলানাথ বাবুর বাটীতে রহিল, ভোলানাথ বাবু ও বেলা তাহাকে যথেষ্ট আদর যত্নে রাখিল। তাহারা তাহার আচরণে মুগ্ধ হইয়া গেল। পল্লীগ্রামের এই সরল দৃঢ় বৃদ্ধটীকে তাহারা স্নেহের চক্ষেই দেখিত এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। প্রতীবের শিক্ষাগুরু, তাহারই আদর্শে প্রতীব নিজের চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছে, উদার হৃদয়ের কত পরিচয় দিয়াছে। এই সমস্ত মনে করিয়া তাহার উপর তাহারা বিশেষ অনুরক্ত হইল।

বেলা ভগবানের নিকট যখন পল্লীর গল্প শুনিবার জন্য আব্দার করিত তখন ভগবানের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে স্নেহের উৎস ছুটিয়া আসিত। পল্লীর দুরবস্থা, পল্লীবাসীর হৃদয়ের কথা, পল্লী নারীর অদ্ভুত চরিত্র বিষয়ে অনেক কথা, আপনার মনে বলিয়া যাইত। গ্রামের দুরবস্থার কথা শুনিয়া বেলার বুক ফাটিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইত। ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিত আচ্ছা ভগবান কাকা, পল্লীর স্কন্ধ হইতে কি এই দুঃখের বোঝাটা কোনও রূপে নামান যায় না?

ভগবান চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে উত্তর দিত, যায় বই কি মা, যদি প্রতীবের মত ছেলে বাংলার প্রতি পল্লীতে একটী করিয়াও জন্মায়

তবে গ্রামগুলো আবার সুখের মুখ দেখে, হাসি ভরা হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তাত হবেনা মা। পল্লীবাসীর অন্তরটাও বিধাতা এমন ক'রে গড়ে দিয়েছেন, যে, তারা কারো ভালত দেখতে পারবে না। যদি কেহ তা'দের উপকার করতে আসে তবে তার প্রতি সহস্র অত্যাচার করিয়া তাকে পল্লীত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে।

বেলা—আশ্চর্য্য বটে।

ভগবান—তাদের হৃদয় নিষ্ঠুরতায় ভরা, পরশ্রীকাতরতাপূর্ণ সহানুভূতি হীন। যারা একটু মানুষের মতন হয়েছে তারা এদের দয়ায় পল্লী ছেড়ে দিয়ে সহরে এসে বাস করিতে বাধ্য হয়েছে।

বেলা—প্রতীব বাবুর মুখেও ঠিক এই কথা শুনেছি। একদিন ভোলানাথ বাবু ভগবানকে বলিলেন, দেখ ভগবান অনেক দিন হইতেই একটা আশা আমি হৃদয়ে পুষে রেখেছি, তোমার নিকট প্রকাশ না করেও ত থাকতে পারছি না।

ভগবান আগ্রহের সহিত বলিল, কি বলুন না কর্ত্তাবাবু।

বলব বলেইত কথাটা পেড়েছি ভগবান। বেলার আমার বয়সও ত অনেক হয়ে গেল, এত অনুসন্ধান করলুম, মনের মত পাত্রও ত একটা খুঁজে পেলুম না, আমার ইচ্ছা তোমার ছোট বাবুর সহিত তাহার বিবাহ দিই। এত অনুসন্ধান করিলাম তার মত একটী পাত্রও আমার চখে পড়ল না। প্রতীবের যেরূপ উদার হৃদয় আমার বোধ হয় তাহার সহিত বেলার বিবাহ হ'লে বেলা আমার সুখী হইবে।

—কিন্তু কর্ত্তাবাবু আমাদের ছোট বাবুর বিষয় আসয় কিছুই নেই।

—তা নাইবা থাকল ভগবান, বিবাহ হইলে এই বিপুল সম্পত্তি প্রতীবই পাইবে।

আজ্ঞে কর্ত্তাবাবু! আপনি আপনার মতনই কথা বলেছেন। আজ আমার প্রাণে যে কি আনন্দ হচ্চে তা আর বাক্যে কি বলব? ছোটবাবুর সঙ্গে বেলা মার বিবাহ হইলে, মা আমার যে কষ্ট পাবেনা তা আমি হলফ্ করে বলতে পারি কর্ত্তাবাবু।

আমিও তা জানি ভগবান। আর বেলাও প্রতীবকে মনে মনে যথেষ্ট ভালবাসে। উঁহাদের বিবাহ হইলে যে দুই জনেই সুখী হইবে সেটা আমি বেশ জানি, আর জানি বলিয়াই এ প্রস্তাব করিতেছি কিন্তু—

এর মধ্যে আবার কিন্তু কি আছে কর্ত্তাবাবু কেবল এ বিষয়ে একবার মনোতোষ বাবুর অভিমত জানা প্রয়োজন। হাজার হইক তিনি তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। অন্য সময় হইলে কি হইত বলাযায় না, কর্ত্তাবাবু, কিন্তু এখন তিনি যেরূপ পাগলের মত হয়ে গিয়েছেন, কৃত কর্ম্মের জন্য এখন যেরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তাতে তিনি এক কথায় রাজী হইবেন।

—তবুও তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।

আমি কালই দেশে যাইয়া তাঁহাকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মতামত লইয়া আবার এখানে ফিরিয়া আসিব।

ঈশ্বর করুন মাকে আমাদের গ্রামের মঙ্গলচণ্ডীরূপে নিয়ে যেতে পারি। কথামত তৎপর দিবসেই ভগবানের গ্রামে যাইবার দিন স্থির হইল।

বেলা এসমস্ত কথা কিছুই জানিত না। ভগবানের যাইবার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত শীঘ্র কেন যাবে ভগবান কাকা, আরও দুই দিন থাকিয়া যাও!

ভগবান একগাল হাসিয়া বলিল, দুই তিন দিনের মধ্যে আবার ফিরে আসব মা।

তবে যাবেই বা কেন কাকা।

একটা বিশেষ জরুরি কাজ আছে মা।

এমন কি জরুরি কাজ পড়্‌ল, শুনি।

তোকে আমাদের গ্রামবাসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী করে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে মা।

যাও বলিয়া বেলা মুখ ফিরাইয়া লইল। ভগবান হাসিয়া বলিল আমি কর্ত্তাবাবুর মত পেয়েছি। জেল হতে ছোটবাবু বেরিয়ে আসুক তারপর বুঝব তুমি কেমন "যাও" বল। শুনিয়া বেলার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল, আর কোনও কথা বলিতে পারিল না।

তাইত বাবা—ভগবান কাকা কেন এখনও ফিরে এলোনা বল দেখি ?

আর কি আমার এখন সে দিন আছে মা ? অপেক্ষা কর মা তোর এই অকৃতজ্ঞ পিতার আরও কত শোচনীয় পরিনাম আছে দেখবি।

কি বলছ বাবা, তার ঠিক নেই। তোমার এমন কি হয়েছে, মন হতে গ্লানিগুলোকে দূর করে দাও, পূর্ব্বে যেমন ছিলে আবার তুমি তেমনই হইবে।

তা আর হয় না মা। অনুতাপের শত বৃশ্চিক দংশন জ্বালা এই বুড়োর হৃদয়টাকে জর্জ্জরিত করে দিচ্ছে। সেই ছোড়াটার উপর যত অত্যাচার করেছি দিবারাত্র, বুকের মধ্যে জলন্ত অক্ষরে উঁকি মারছে। যেই একটু অন্য মনস্ক হবার চেষ্টা কর্‌ছি অমনি কোথা হতে যেন কে দৃঢ়স্বরে বলে উঠছে, অকৃতজ্ঞ সয়তান ! কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপ কর। এইত তোর পাপের ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে।

এর জন্য অনুতাপের কি আছে, বাবা, প্রতীবদার সম্পত্তি

তাকে ফিরে দিন, অনুতাপের স্থলে আনন্দে, অশান্তির স্থলে শান্তিতে প্রাণ ভরে উঠবে, আবার তুমি যে মানুষ ছিলে সেই মানুষই হবে। তুমি সুস্থ হবে বাবা।

তা আর হয় না মা। এই বুকে মস্ত একটা পাপ রয়েছে মা। একখানা কচি বুককে ও তোকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি মা? তুষের আগুনে ধিকিধিকি পুড়িয়ে মারছি। ওঃ কি নিষ্ঠুর আমি, কি সয়তান।

কেন তুমি দিন রাত্তির এমন করছ বাবা—আমার অদৃষ্ট, আমার নিয়তি—তুমি আর কি করবে বাবা।

সে অদৃষ্টকেত আমি নিজেই ডেকে এনে দিয়েছি। তোকে সামনে দেখলে আমার মাথায় ইট মেরে মরতে ইচ্ছে করে তৃপ্তি। এমন অত্যাচার অবিচার আমি তোর উপর করেছি।

আবার সেই কথা বাবা। যদি তুমি অমন কর তা হলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে, না হয় বিষ খেয়ে মরব।

চম্‌কিয়া মনোতোষ বলিল, না তৃপ্তি না—আর আমার পাপের বোঝা বাড়াসনে তৃপ্তি, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্চে। তোর এই দুর্দ্দশা দেখে তোর স্বর্গীয় মা—দিন রাত আমার আশে পাশে ঘুরে কেবলই বলছে—একি করলে তুমি, দুই কোলে দুই জনকে বসাইয়া স্তন পান করাইয়াছি, মরণের সময় এত ক'রে অনুরোধ করে এলাম—আমার সে অনুরোধটা রক্ষা করতে পারলে না। নিজের জেদে আমার তৃপ্তিকে এই কচি বয়সে

সন্ন্যাসিনী সাজালে। আমার এই আত্মাকেও একটু সুখী করিলে না।

ওসব তোমার মনের ভুল বাবা। দিবা রাত্র ঐ সব আলোচনা করে মনটাকে কেবলই খারাপ করছ, দোহাই বাবা তুমি একটু স্থির হও, মা কালী তোমার ভাল করুন।

মনোতোষের এখন পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ আসিয়াছে। তাহার স্নানাহার একরূপ বন্ধ বলিলেও হয়। তৃপ্তি জোর করিয়া তাহাকে স্নানাহার করাইয়া দেয়। সর্ব্বদাই কেমন এক উদাস বিভ্রম দৃষ্টি। কন্যা তৃপ্তির সহিত যখন উপরোক্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ভগবান আসিয়া ডাকিল—কর্ত্তাবাবু।

মনোতোষ বলিয়া উঠিল কে ভগবান? কি দেখে এলে ভগবান? দেখে এলে—জেলে আছে? ঘানি টানছে? তাকে ঘানি টানাবার মূল কে জান ভগবান?—এই—আমি। বলিতে বলিতে মনোতোষের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ভগবান তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল—শুনুন না কর্ত্তা মহাশয়!

কি আর শুনব ভগবান, তার বাপের জমিদারী থাকতে আমার জন্য সে আজ জেলে ঘানি টান্‌ছে—তার সব ফাঁকি দিয়ে নিয়ে শেষে তাকে ঘানি টানালুম্, ও কি প্রবঞ্চক আমি!

ঘানি তাকে টানতে হয় না কর্ত্তা মহাশয়।

সত্য বলছ ভগবান ঘানি টানতে হয় নি?

আপানার পা ছুঁয়ে বলছি।

আঃ—কিন্তু জেলত হয়েছে ?

হাঁা তা হয়েছে, কিন্তু যে কাজের জন্য তার জেল হয়েছে সে কাজের জন্য তার ফাঁসি হলেও তাতে আপনার গর্ব্ব করবার ছিল।

তাই নাকি ? হাঁা ভগবান কি ঘটনায় তার জেল হল ? ভগবান সমস্ত নিবেদন করিল। শুনিয়া মনোতোষ বলিল—তাই নাকি ? ছোড়াটা চির কালই ন্যায়ের পথে, ধর্ম্মের পথে চলে আসছে।

একটা খবর আছে কর্ত্তা বাবু।

কি খবর ভগবান।

ছোট বাবু যার টাকায় অফিস করেছে না—যিনি প্রায় কুড়ি পঞ্চিশ লাখ টাকা এই ব্যবসা করতে দিয়েছেন, সেই বাবুর একটী মাত্র মেয়ে যেন গোলাপের কলি—রং টুক টুক করচে, আজ কাল এমন মেয়ে একটীও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, যেমন খোলা মন তেমনই উচু প্রাণ।

তা কি হয়েছে ভগবান।

সেই বাবু, আমাদের ছোট বাবুর সহিত তাঁর মেয়েটীর বিবাহ দিতে চান—কিন্তু আপনার মত না পেলে তিনি এ কাজ কিছুতেই করতে পারেন না।

তৃপ্তি বলিয়া উঠিল, এত সুখের কথা ভগবান কাকা। এর চেয়ে আর সুখের কথা কি হতে পারে ? কি বলেন বাবা ?

আমি আর কি বলব মা—সে এখন ঢের বড়।

ভগবান।—তবুও আপনার মত না হলে এ কার্য্য কিছুতেই হতে পারে না কর্ত্তা বাবু। আপনাকে তাহারা এখনও ছোট বাবুর অভিভাবক বলেই জানেন।

তৃপ্তি।—এতে আর অমত করোনা বাবা।

মনো।—না মা এতে আর অমত করবার কি আছে মা, বলিয়া মনোতোষ একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তৃপ্তি সে দীর্ঘশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পারিল, বলিল তবে তুমি একখানা চিঠি লিখে দাও বাবা।

ভগবান।—না মা এ সংবাদ লয়ে আমাকে নিজেই যেতে হবে।

প্রতীবের জেল হইবার পর বেলা তাহার জীবনের সমস্ত ধারা বদলাইয়া দিয়াছিল। জাতিয়তা রক্ষা করিতে ব্যাগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল নারীস্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা প্রচারিত হইতেছে, যে জাতি পথে ঘাটে অন্যের লোলুপ দৃষ্টি হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে এখনও অসমর্থা, নিজের আত্ম-সম্মান রক্ষা করিবার শক্তি সামর্থ যাহাদের নাই, তাহাদের স্বাধীনতার দাবি করা ধৃষ্টতা মাত্র। তাই সে পূর্ব্বের বিদেশী সাজ সজ্জা ছাড়িয়া দিয়া শাড়ী পরিল, পাদুকা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী মেয়েরই মত খালি পায়ে চলিতে লাগিল। এত দিনের অভ্যাসকে ত্যাগ করাতে তাহার কোন কষ্ট হইল না বরং প্রাণে একটা অননুভূত আনন্দ বাড়িল। সে সর্ব্ব প্রকার অনুকরণ ছাড়িয়াদিল, আর বাটীর বাহির হইত না।

ভগবান চলিয়া গেলে বেলার মনটা কেমন শূন্য হইয়া পড়িল। প্রতীব নাই, বৃদ্ধ ভগবানের নিকট সে নানা বিষয়ে কথা কহিত। ভগবানের নিকট হইতে পল্লী গ্রামের কথা, পল্লীর আচার ব্যবহার, চাল চলনের কথা শুনিত। সে চলিয়া যাওয়াতে তাহার আর কিছুই

ভাল লাগিত না। এত বড় বাড়ী খানা তাহার নিকট মরুভুমি বলিয়া মনে হইত। অন্য সময় হইলে সে থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিয়া সময় কাটাইয়া দিত। কিন্তু এখন আর সে সব ভাল লাগিল না, কোনও সমবয়সীদের সহিতও সাক্ষাৎ করিতে যাইত না। তাহাদের বিলাসিতা পরানুকরণ প্রিয়তার জন্য তাহাদিগের উপর বিজাতিয় ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল। কতকটা সময় সে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া কাটাইয়া দিত কিন্তু সমস্ত দিন আর রামায়ণ মহাভারতে কাটে না, তাই সে এক দিন ভোলানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল ভগবান কাকাকে ছেড়ে দিলে কেন বাবা? তার সরল প্রাণের কথা আমার বড় মিষ্টি লাগত, তাকে লয়ে আমার সময়টা এক রকমে বেশ কেটে যেত, কবে সে আসবে বাবা?

ভোলা।—কিরূপে জানব মা, যে সে এত দিন বিলম্ব করবে, দু এক দিনের মধ্যেই তার ফিরে আসবার কথা। আমার ভয় হচ্চে মা, সে সেখানে কোনওরূপ অসুখে পড়ল কিনা?

বেলা।—বাস্তবিকই বাবা। আমারও তার জন্য ভাবনা হচ্চে, তার না আসবার কারণ জানিয়ে একখানা পত্রও দিতে পারত।

তাহাদের কথা বার্ত্তার মধ্যস্থলে বৃদ্ধ দয়াল একখানা খামে আঁটা পত্র আনিয়া দিল। পত্রের উপরের দক্ষিণ ডিহি ডাক ঘরের ছাপ মারা আছে। বেলা বলিয়া উঠিল, খামখানা খুলে দেখনা বাবা, চিঠিখানা কোথা হতে এলো।

ভোলানাথ বাবু বলিলেন, বোধ হয় ভগবানের পত্র মা, খামের

উপর তাহাদের গ্রামের ছাপ মারা—বলিয়া মৃদু হাসিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন, পড়িতে পড়িতে আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন—পরিণাম ঐ রূপই হয় বটে।

তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া বেলা বলিয়া উঠিল কি হয়েছে বাবা ?

এই দেখনা মা পড়ে, বলিয়া ভোলা নাথ বাবু বেলাকে পত্র খানা দিলেন। বেলা পত্রখানা পড়িতে পড়িতে মনোতোষের দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং তাহার বিবাহ সম্বন্ধে মনোতোষ বাবুর পূর্ণ মত জানিতে পারিয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

ভোলানাথ বাবু নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বলিলেন—অধর্ম্মের প্রথম সোপান বড়ই মধুর কিন্তু পরিণাম বড়ই ভীষণ। তার কথা শুনে দুঃখ হয় মা মনে হয় একবার যেয়ে দেখে আসি। যাক্ এখন তোর সম্বন্ধে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম মা, সে মুক্ত হয়ে এলে আর কাল বিলম্ব করব না, শুভ কার্য্য যত শীঘ্র হয় সম্পন্ন করে দেব। লজ্জায় বেলার মাথা নতহইয়া গেল, সে আর কোন কথা কহিল না।

মনতোষ বাবুর মনের গতি দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। পল্লী গ্রামের এই বাটী খানির মধ্যে তাহাকে আর কিছু দিন আবদ্ধ রাখিলে হয়ত উন্মাদ হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কা ভগবানের হৃদয়ে দেখা দিল। এই পরোপকারী বৃদ্ধটী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তৃপ্তিকে তাহার হৃদয়ের কথা জানাইল। তৃপ্তি ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিল না ভাবী বিপদের আশঙ্কায় কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। ভগবান সান্ত্বনা দিয়া বলিল, এখন কাঁদিবার সময় নয় মা, এখন তোমার পিতা যাহাতে সুস্থ হয় তাহাই করিতে হইবে।

তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থ স্থানগুলি দর্শন করিবার সঙ্কল্প করিয়া মনোতোষ বাবুকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। দুই তিন মাস তীর্থ ভ্রমন করিয়া মনোতোষ বাবু যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন—একদিন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান? প্রতীব কতদিনে মুক্ত হইবে বলিতে পার?

আর্ত্ত বেশী দেরী নাই বাবু।

তবে এবার কলিকাতায় চল ভগবান, জেলের দুয়ার হতে প্রতীবকে বুকে করে আনতে না পারলে আমার কিছুতেই শান্তি

হবে না। তৎপর দিবস তাহারা কলিকাতায় রওনা হইল, এবং কলিকাতায় আসিয়া একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিল।

একদিন ভগবান ভোলা নাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া মনোতোষের কলিকাতায় আগমন বিষয় জানাইল। ভোলানাথ বাবুও বেলা তাহাদিগকে নিজের গৃহে লইয়া আসিলেন।

এই নিঃসঙ্গ পুরীর মধ্যে বেলা, তৃপ্তিকে পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তৃপ্তি তাহাকে প্রথম হইতেই বৌদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা এরূপ বাড়িয়া চলিল যে এক দণ্ড কাছ ছাড়া হইত না।

ছয় মাস কাটিয়া গেল, প্রতীব কারাগার হইতে মুক্তি পাইল। কারাগৃহের বাহিরে মনোতোষ বাবু, ভোলানাথ বাবু, ভগবান ও তাহার কর্ম্মচারিগণ তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সুসজ্জিত মোটর লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রতীব কারাগৃহের বাহিরে আসিলে সকলের মুখে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল, সকলেই তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। প্রতাবের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল। মনোতোষবাবু সজল নয়নে তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রতাব আশ্চর্য্য হইয়া গেল। প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। মনোতোষ বাবু বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই কান্না দেখিয়া প্রতীবের প্রাণ অজানিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল ও জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে কাকা?

সে সব বাড়ীতে শুনিও বাবা—বলিয়া ভোলানাথ বাবু তাহার হাত ধরিয়া মোটরে উঠাইলেন। প্রতীব যুক্তকরে তাহার কর্ম্মচারী-দিগকে নমস্কার করিল।

বাড়ীতে আসিয়া প্রতীব দেখিল, তৃপ্তি তাহার জন্য দ্বার দেশে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই, এস প্রতীব দা, বলিয়া সজল নয়নে তাহাকে প্রণাম করিল।

তৃপ্তিকে দেখিয়া প্রতীব নির্ব্বাক হইয়া গেল। এই সেই তৃপ্তি, আজন্ম হতভাগিনী তৃপ্তি, যে কেবল বুক ভরা হাহাকার আর হৃদয় ভরা ক্রন্দন লইয়াই জন্মিয়াছে! হায় নিয়তির কি কঠোর পরিহাস!

তাহাকে স্তব্ধের ন্যায় থাকিতে দেখিয়া তৃপ্তি বলিল, কি ভাবছ দাদা? উপরে চল।

প্রতীব সে কথায় উত্তর না দিয়া বলিল, এ তুই কি হয়েছিস তৃপ্তি? তোকে যে এ বেশে দেখতে হ'বৈ এ যে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। কথা কয়টী বলিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

তৃপ্তি তাহার অন্তরের ব্যথার কথা বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, কি করিবে দাদা এ আমার অদৃষ্ট।

বেলাকে না দেখিয়া প্রতীব জিজ্ঞাসা করিল, বেলা কোথায়,—

তৃপ্তি। চলনা দাদা তোমাকে তার কাছে লয়ে যাই, তোমার সামনে আস্‌তে তার লজ্জা হচ্চে।

হাসিয়া প্রতীব বলিল, আমার সামনে আস্‌তে তার লজ্জা ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, চলনা, বলিয়া তৃপ্তি তাহাকে উপরে বেলার ঘরে লইয়া গেল এবং বেলাকে বলিল, এই দেখ বৌদি, দাদা এসেছেন।

বেল। একহাত ঘোমটা টানিয়া লজ্জাশীলা বধূটীর মত আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। প্রতীব তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, একি পরিবর্ত্তন বেলা ?

বেলা ক্রমশঃই যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল, যেন কোনও-রূপে তাহার সম্মুখ হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। তৃপ্তি বুঝিতে পারিয়া বলিল, প্রতীব্‌দা' ! তুমি যে নারীজাতির ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জেলে গিয়াছিলে, আমার বৌদি সেই নারী জাতিরই একজন। এটা তোমার মনে রাখা উচিত ?

প্রতীব কতকটা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সেই ঘর হইতে পলায়ন করিল। তৃপ্তিকে একটা ছোট রকমের ধাক্কা দিয়া বেলা বলিল, তুই ভারি দুষ্ট।

প্রতীব সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যথায় ভোলানাথ বাবু, মনোতোষ বাবু ও ভগবান বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইল। ভোলানাথ বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন। প্রতীব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া অফিসের কথা, কাজ কর্ম্মের কথা প্রভৃতি জানিয়া লইতে লাগিল।

মনোতোষ বাবুর আর বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না। তাঁহার কৃত কার্য্যের জন্য প্রতীবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ব্যাকুল হইয়া

উঠিলেন। প্রতীব ও ভোলানাথ বাবুর কথার মধ্যস্থলে মনোতোষ বাবু বিচলিত ভাবে ডাকিলেন, প্রতীব!

বিনয় নম্র বচনে প্রতীব উত্তর দিল, কি আজ্ঞা করুন কাকা—

আমায় ক্ষমা করিতে পারিবে কি, বাবা?

এমন কথা বলে আমার পাপের মাত্রা বাড়িয়ে দেবেন না কাকা, বলিয়া প্রতীব তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

মনোতোষ বাবু তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, না বাবা পাপের মাত্রা কেন বাড়িয়ে দেবো? কিন্তু আমার বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বল্‌ছে, সে আগুনের জ্বালা যে সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না বাবা, তোর উপর যে অত্যাচার করেছি—

ছিঃ কাকা অমন সব কথা বলবেন না—তার পর প্রতীব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা কাকা! আপনারা সকলেইত আমার উপর রাগ অভিমান ভুলিয়া আমাকে দেখিতে আসিলেন কিন্তু কাকীমাত আসিলেন না। তিনি কি এখনও আমাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না? একটা উদাস দৃষ্টিতে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনোতোষবাবু বলিলেন, সে আর নেই বাবা। নিজের কৃত কার্য্যের ফল ভোগ করিতে কেবল আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া সে অন্য জগতে চলিয়া গিয়াছে।

সে কি!

আর কি বাবা, সকলেই যে যার পথে চলে গেল, কেবল পাপের ফল ভোগ করবার জন্য আমায় ফেলে রেখে গেল। এখন

অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে প্রাণটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্চে। তোরা আমায় ক্ষমা না করলে আমি এতটুকুও শান্তি পাবনা, বাবা।

কাকা, কেন মিছামিছি আপনি আমার বিষয় লইয়া এত চঞ্চল হচ্ছেন। আপনি আমার ত কিছুই করেন নাই। এতটুকু বয়স হতে আমাকে আপনার বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছেন। আপনাকে আমি পিতার অধিক ভক্তি করি, মাকে বাবাকে আমার মনে পড়ে না কিন্তু আপনারাই যে তাঁদের হয়ে আমাকে লালন পালন করেছেন! আপনার উপর যদি কোন রাগ বা অভিমান থাকে তবে স্বর্গ হতে আমার মা, বাবার এবং কাকীমার অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। যত দিন বাঁচব তত দিনই মনে থাকবে আপনি আমাকে পিতার মত যদি শাসন না করতেন তবে আমি এ গৌরব কখনও প্রাপ্ত হতাম না। আমার এ সৌভাগ্যের মূল আপনি।

ভগবান এতক্ষণ প্রতীবের কথাগুলি এক মনে শুনিতে ছিল। সে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—দেখলেন কর্ত্তা—আমি বরাবরই সেই কথাই বলে আস্‌ছি। ভূল কার না হয়, মুনি ঋষির ও হয়। আপনি ত একজন সামান্য মানুষ। মনের মলাগুলো টেনে ফেলে দিন।

তারপর প্রতীব তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ভোলানাথ বাবুর ও মনোতোষ বাবুর পদধুলি গ্রহণ করিয়া সে দিনের জন্য বাসায় চলিয়া গেল। ভগবান তাহার সঙ্গ ছাড়িল না, সেও প্রতীবের সহিত চলিয়া গেল।

ভোলানাথ বাবু পূর্ব্ব হইতেই প্রতীবের বাসার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন সুতরাং বাসায় যাইয়া তাহার কোনও কষ্ট হইল না। দিবাভাগটা ভগবানের সহিত কথা বার্ত্তায় একরূপ কাটিয়া গেল। রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার মনে স্বতঃই উদয় হইল এই ছয় মাসের মধ্যে তাহার আত্মীয় স্বজনের কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তৃপ্তির বিষাদ পূর্ণ জীবন, তাহার প্রতিপালক কাকার তীব্র অনুশোচনা, সর্ব্বোপরি বেলার এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন তাহার হৃদয়কে দুঃখে ও আনন্দে ডুবাইয়া দিল। দুঃখ হইল তৃপ্তির কণ্টক ময় ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য। এ সংসারে তাহাকে কত দিন এই বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে হইবে।

আবার মনে পড়িল, মনোতোষ বাবুর এই পরিবর্ত্তন। ঈশ্বর যে তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া তাহাকে আবার পূর্ব্বেকার মত করিয়াছেন, তাহার জন্য ঈশ্বরের পদে মনে মনে প্রণাম করিল।

তারপর বেলার কথা ভাবিতেই প্রতীবের শরীর পুলকে পূর্ণ হইল, কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এই বেলার। স্বপ্নের অতীত, ধারণার

বহির্ভূত, পরিবর্ত্তন এমন সহজ সরল ভাবে ঘটিতে দেখিয়া তাহার প্রাণ আনন্দে প্রফুল্লিত হইল। তাহার কারাবরণের ফলে যে এতটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার জন্যে এই সময়টাকে তাহার জীবনের শুভ সময় বলিয়া মনে করিল। কেবল বেলার এই পরিবর্ত্তন নয়, বেলা তাহার জীবনের সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে, এই কথাটা বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রাণে এক অভিনব আনন্দের উদয় হইল। কত ভবিষ্যৎ সুখের ছবি মনের মধ্যে আঁকিতে আঁকিতে আনন্দে মগ্ন হইল। ইতি মধ্যে তাহার অজানিত ভাবে শান্তিদায়িনী নিদ্রা আসিয়া তাহার সকল চিন্তার অবসান করিয়া দিল। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, বেলা অনেকটা হইয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বেশ ভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া ভোলানাথ বাবুর বাটীর দিকে রওনা হইল।

ভোলানাথ বাবুর বাটী পৌছিয়া প্রতীব দেখিল মনোতোষ বাবু ও ভোলানাথ বাবু তখন চা পান করিতেছেন। বেলা সেখানে বসিয়া আছে। প্রতীবকে দেখিয়াই সে লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেল। প্রতীব জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে চা পান করছ না বেলা!

ভোলানাথ বাবু কন্যার হইয়া উত্তর দিলেন, তুমি জান না প্রতীব বেলা এখন সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়া গিয়াছে। সে এখন আর চা খায় না। আরও তুমি শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে বেলা এখন miss বেলা নয়—এখন শ্রীমতী বেলা দেবী। পিতার মুখে নিজের

কথা শুনিয়া বেলা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া গেল—দ্রুতপদে সে ঘর হইতে পলাইয়া তৃপ্তির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল।

ভোলানাথ বাবু একথা সে কথার পর প্রতীবকে বলিলেন দেখ এ বুড়োর একটা অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে।

প্রতীব বিনয় নম্র বচনে বলিল, কি আজ্ঞা করুন,

ভোলানাথ বাবু—দেখ বাবা, এই সংসার বন্ধন আর আমার ভাল লাগছে না। চিরকালই এই ভুতের বোঝা বয়ে এসেছি। এখন তার হাত হতে কোনও রূপে নিষ্কৃতি পেয়ে জীবনের বাকী কটা দিন তীর্থবাস করব মনে করেছি।

প্রতীব ধীরভাবে বলিল—তা বেশত, মাঝে মাঝে ঘূরে আসুন না।

তাত আসব বাবা, কিন্তু কাঁধের উপর যে একটা মস্ত বোঝা চেপে রয়েছে। সে বোঝাটাকে নামাতে না পারলে ত আর কিছুই করতে পারছিনা। সেই বোঝাটা যদি তুমি গ্রহণ কর তবে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

প্রতীব এ কথার কোনও উত্তর দিল না। ভোলানাথ বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন—অনেক যাযগায় বেলার জন্য পাত্র দেখতে গিয়েছি কিন্তু কোনটাই আমার পছন্দ মত হয় নি। আর একটা কথা বাবা—বেলাকে দেখে মনে হয় সে তোমার আদর্শ টাকে তার হৃদয়ের পরতে পরতে গ্রহণ করেছে—কেবল তাই নয় তাকে দেখে বেশ মনে হয় যে সে তোমার প্রতি অনুরাগিনী। এ অবস্থায়

তুমি যদি তাকে গ্রহণ কর, তবে তোমরা দুই জনেই সুখী হবে—

প্রতীব লজ্জায় কোনও কথা বলিতে পারিল না, কিইবা বলিবে। যেরূপ ব্যাপার ঘটিতে চলিয়াছে এ যে তাহার স্বপ্নের অগোচর!

তাহাকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া মনোতোষ বাবু বলিলেন, একথা তোমায় রাখ্‌তে হবে প্রতীব, না রাখলে মনে ভারি দুঃখ হবে, আমি এরই মধ্যে ভোলানাথ বাবুর সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছি—আমাদের এ অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে।

প্রতীব ধীর ভাবে বলিল, আপনাদের কথার উপর কথা বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।

মনোতোষ বাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, ব্যাস্। তবে বেই মশায়, আপনি পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহের দিন স্থির করুন। শুভ কার্য্য এই মাসেই সম্পন্ন হইয়া যাক্। ভোলানাথ বাবু ও সানন্দে মনোতোষ বাবুর প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন।

পুরোহিত মহাশয় আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া একটী দিন স্থির করিয়া দিলেন। ঠিক এক পক্ষের মাথায় ২৬শে বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির হইল।

সমস্ত কথাবার্ত্তার পর মনোতোষ বাবু বলিয়া উঠিলেন, সবই

ঠিক হলো বেহাই মশাই, বিবাহ এই স্থান হইতেই হউক কিন্তু বৌভাত আমাদের দেশে প্রতীবের পৈতৃক বসত বাটীতে হইবে।

ভোলানাথ বাবু বলিলেন।—সেত ভাল কথাই বেহাই মশায়, এতে আমার কোনও আপত্তি নাই। পিতা মাতা এক গণ্ডুষ জল পাবার জন্যই সন্তান কামনা করে। আপনার একথা শুনে আমার আনন্দই হচ্চে। যাক তা'হলে আজ সন্ধ্যার সময় প্রতীবের বাসায় যাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব।

সেই দিনই প্রতীব মনোতোষ বাবু ও তৃপ্তিকে নিজের বাসায় লইয়া গেল। সন্ধ্যার পর ভোলানাথ বাবু তাহার দুই চারিজন বন্ধু এবং পুরোহিত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া প্রতীবকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। বর পক্ষে মনোতোষ বাবু ও বিজলী বাবু, ভগবানকে সঙ্গে লইয়া বেলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। প্রতীব তাহার দুর্দ্দিনের বন্ধু বিজলী বাবুকে ভুলিতে পারে নাই।

ইতিমধ্যে ভগবান প্রতীবের ভদ্রাসনখানি বাসোপযুক্ত করিবার জন্য যথোপযুক্ত অর্থ সঙ্গে লইয়া গ্রামের দিকে যাত্রা করিল। যাইবার সময় হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেল—দেখুন বাবু! আজ দেশ যাচ্চি বলে যেন মনে করবেন না আমি বরযাত্রী হয়ে যেতে পাব না—বিয়ের দিন কিন্তু আমি এসে হাজির হব।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোতোষ বাবুর নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া গ্রামের অনেকেই আসিয়া হাজির হইল।

প্রতীবের বাসা খানি আজ আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। একা তৃপ্তিই সকল কাজের ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গেল। বিজলী ও মনোতোষ বাবুরত কথা'ই নাই, বাজার হাট, অতিথি

অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় তাহারা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। দিনের সমস্ত সময়টা আনন্দ উৎসবে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে বর বাহির করিবার জন্য তাড়া পড়িয়া গেল—শঙ্খ ও হুলুধ্বনির ভিতর প্রতীব সহিত বর বেশে প্রকাণ্ড ব্রুহামে যাইয়া উঠিল।

শুভলগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। পরদিন মনোতোষ বাবু বর ও বধু লইয়া গ্রামখানির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন বিদায়কালে পিতাগতপ্রাণ বেলা কাঁদিয়া ফেলিল, ভগবান বেলাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, কান্না কেন মা, তুই যে আমাদের গ্রামখানার শুভদায়িনী দেবীরূপে অধিষ্ঠিত থাকবি, বলেছিস।

বর ও বধু লইয়া মনোতোষ বাবু গ্রামে আসিলেন। প্রতীবের বিবাহ উপলক্ষে মৃতকল্প গ্রামখানা আবার সজীব হইয়া উঠিল। আজ মনোতোষ বাবু তাহার কৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিয়াছেন। প্রাণে আনন্দ স্রোত সহস্র ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। প্রতীব এখন নিজেই একজন ধনী বলিয়া গণ্য হইয়া পড়িয়াছে তাহার উপর মনোতোষ বাবুর ইচ্ছায় গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতার সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

আজ বৌভাত ও ফুলশয্যা। নিমন্ত্রিত হইয়া ভোলানাথ বাবু ও বিজলী বাবু কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। এই সমারোহ ব্যাপারে তাঁহাদিগকেও চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইতেছে।

কাজকর্ম্ম মিটিয়া গেলে মনোতোষ বাবু, ভোলানাথ বাবু ও বিজলী বাবুর সম্মুখে প্রতীবকে কতকগুলি দলিল দিয়া বলিলেন, এই

লও বাবা তোমার পিতার সমস্ত সম্পত্তির দলিল। বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া যে সব সম্পত্তি আমার নামে করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তোমাকে দান পত্র করিয়া দিয়াছি।

প্রতীব সবিনয়ে বলিল না কাকা! এ সমস্ত আপনিই রাখিয়া দিন—এ সব তৃপ্তির।

তৃপ্তির পিতার যা আছে বাবা, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট, আর তাকেও ত আমার অবর্ত্তমানে তোমাকেই দেখিতে হইবে। আর কোনও কথা বলিও না বাবা · যে কাজ করেছি তার শাস্তি যথেষ্টই পেয়েছি, এখন আমাকে মনের শান্তিতে থাকৃতে:দে বাবা।

প্রতীব আর কিছু বলিল না—তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তারপর ফুলশয্যার রাত্রি। পাড়ার এয়োস্ত্রীরা মিলিয়া করণীয় কার্য্য করিয়া বর ও বধূকে এক শয্যায় পাশাপাশি বসাইয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রতীব বেলার হাত ধরিয়া গৃহগাত্র সংলগ্ন দুইখানি চিত্র দেখাইয়া বলিল বেলা এই আমার বাবার ও মার চিত্র। চল তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। বেলা প্রতিবের সহিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই তৈল চিত্রের উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। দেখিল যেন চিত্রের মধ্য দিয়া তাহার শ্বশুর ও শাশুড়া তাহাদিগকে মৃদু হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

বেলাকে পাশে বসাইয়া প্রতীব বলিল, এ গ্রামখানা তোমার ভারি নীরস লাগছে, নয় বেলা! আরো দুটো দিন থাক তার পর তোমার সইয়া যাইবে।

হাসিয়া বেলা বলিল, নীরস লাগবে কেন? আর লাগলেও ত এ গ্রাম ছেড়ে ত যেতে পারব না। এ যে আমার শ্বশুরের ভিটা। এইখানে থাকিয়া এই গ্রামখানাকে আবাব নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভগবানের গড়া এই পল্লীর চেয়ে কি মানুষের গড়া সহরের বৈচিত্র বেশী? তা ত নয়। আমি এইখানে থাকিয়া ভগবান কাকার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। গ্রামের ছেলেদের শক্তি সামর্থের উৎকর্ষ সাধনায় এবং পরোপকার রূপ দেশহিত ব্রতে সকলকে নিযুক্ত করিতে যত্নবতী হইব।

প্রতীব শুনিয়া আনন্দিত হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিল, তাই হোক বেলা—আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা তোমায় কি বলব—এই **বৌভাতের** দিনটা আমাদের চিরস্মরণীয় হয়ে থাক। আজ আমার পিতৃ সম্পত্তি ফিরে পেয়েছি, আজ এই বৌভাতের দিনে গ্রামখানিও একজন হিতৈষী পাইল, ইহা অপেক্ষা আর কি সুখের দিন আছে। বাহিরে দোরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

সমাপ্ত।

IMPERIAL LIBRARY

কয়েকখানি ভাল বই।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত

নূতন ধরণের সর্ব্ব স্থানে প্রশংসিত

উপন্যাস।

১। **জন্মভূমি**—'এমন দেশটী কোথায় খুঁজে,
পাবে নাক তুমি ;
সকল দেশের সেরা সে যে, আমার জন্মভূমি'

কবির এই উক্তি শিবনাথের চরিত্রে সার্থক হইয়াছে ; কবির কল্পনা মূর্ত্তি পাইয়াছে। দুবালার মত পুত্রবধূ সব শ্বশুরেরই কাম্য। সতী ও সাবিত্রী এক বৃন্তে দুটী ফুল কেমন ফুটিয়া আছে ! মূল্য ১৷৷০।

২। **বঙ্গবধূ**—পুস্তকখানি সর্ব্বত্র আদর পাইয়াছে। আপনিও আদর না করিয়া পারিবেন না—ইহা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি। স্ত্রী-পাঠ্য এমন উপন্যাস খুব কমই বাহির হইয়াছে। তাই বইখানি বঙ্গবধূদের হাতে তুলিয়া দিতে সানুনয় অনুরোধ। ইহাতে দেখিবেন যুবক শ্রীশচন্দ্রের রূপমোহের বিষময় ফল ও পাশ্চাত্যের আদর্শে প্রাচ্য বধূ উমার ক্রম পরিবর্ত্তন। মূল্য ৸৷০।

৩। **স্মৃতিপূজা**—পড়িয়াছেন কি ! স্মৃতিপূজা করিতে লেখা বড় দরকার ইহাতে জীবনের অতীত ফুটিয়া উঠে ; ভবিষ্যতের ভিত্তি শক্ত হয় ; জাতি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। অতএব ক্রয়

করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে আরও পাইবেন দুটী অজানা প্রাণের প্রথম মিলনের মান অভিমান - বিধবার বুকে স্বাবলম্বনের চিত্র—আদর্শে উদ্ধার—পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইবেন। সিল্কের কাপড়ে বাঁধান দামও সুলভ। মূল্য ১৲।

৪। **শান্তি-কুটির**—বইখানির ভিতর বাহির উভয়ই সুন্দর। ইহাতে পাইবেন পল্লীগ্রামের প্রভা, শান্তি-কুটিরের লীলা ও নগরবাসিনী সরযূ। সমাজ গঠনে আপনার দায়িত্ব লইয়া আপনিও ইহাদের একটিকে মূর্ত্তি দিতেছেন। গুরুদেবের কথা আপনাকে নিজের কুটির গড়িতে সাহায্য করিতে পারিবে কি ? মূল্য ১৷৷৹।

৫। **বিয়ের বাঁধন**—মূল্য ১৷৷০।

বহু সাময়িক পত্রে নিয়মিত লেখক

শ্রীজুড়নজীবন মুখোপাধ্যায় বি, এস সি প্রণীত।

১। **নারীর মুক্তি**—প্রকৃত পুরুষের জীবনে নারীর মহিমাময় প্রকাশ উপন্যাসের মধ্যে সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মূল্য ১৸০।

প্রবাসী বলেন—লেখকের লেখা ভাল।

শ্রীক্ষুদিরাম গাঙ্গুলী এম, এস সি, প্রণীত।

নূতন ধরণের সুন্দর লেখা নূতন বই **সুরূপা** মূল্য ১৷৷০।